'রিজিয়া' প্রণেতার টাকা-সংস্করণ গ্রন্থমালার—প্রথম গ্রন্থ

মণিমালা

(সত্যঘটনা-মূলক সামাজিক উপন্যাস)

'রিজিয়া' 'লীলার-স্বপ্ন' ইত্যাদি প্রণেতা 'লা মিজারেবল'
'কেনিলওয়ার্থ' 'হ্যাম্‌লেট' প্রভৃতি গ্রন্থের অনুবাদক
শ্রীমনোমোহন রায় বি-এল্
প্রণীত

প্রকাশক—শ্রীসতীশচন্দ্র মিত্র
লক্ষ্মীবিলাস পাব্‌লিশিং হাউস্
১২নং নারিকেল বাগান লেন, কলিকাতা।

১৩২৫ বঙ্গাব্দ।

৬১নং বৌবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা ;
কুন্তলীন প্রেসে
শ্রীপূর্ণচন্দ্র দাস কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

তাহাকে,

যে আমার নয়নের অঞ্জনরূপিণী। যে আমার হৃদয়ের উৎসব-স্বরূপিনী। যে আমার প্রতিভার পুণ্যজ্যোতি। যে আমার জীবনের ধ্রুবতারা।

মনোমোহন।

ভূমিকা

একটী মাত্র অপরিদৃশ্যমান সূত্রের দ্বারা বিশ্বনিয়ন্তার সিংহাসনের সহিত বদ্ধ রহিয়াছে এই জড় জগৎ। সেই ক্ষীণ সূত্রটীর নাম—নিয়তি। একটী মাত্র শক্তিদ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইতেছে কর্ম্মময় মানবজীবন। এই শক্তির নাম—মহাশক্তির ইচ্ছা। নিয়তির অচ্ছেদ্য বন্ধন ছিন্ন করা, যেমন মানবচেষ্টার অসাধ্য। ইচ্ছাময়ীর ইচ্ছা উল্লঙ্ঘন করার অভিলাষও, সেইরূপ, মনুষ্যের পক্ষে বাতুলতা মাত্র। একটু ধীরভাবে পর্য্যালোচনা করিলে আমাদের প্রত্যেকেই তাহার নিজের জীবনে এই দুইটি কথার যাথার্থ্য উপলব্ধি করিতে পারি।

চেষ্টা দ্বারা যে বিধিলিপি খণ্ডিত হয় না, এই আখ্যায়িকায় বর্ণিত ঘটনাবলীই তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

এই আখ্যায়িকায়, আমি উল্লিখিত সপ্রমাণিত সত্য দুইটি ভিন্ন, আর একটি গভীর স্থির ও জাজ্বল্য সত্যসম্বন্ধে কতকগুলি তথ্যের মীমাংসা ও মানবহৃদয়-নিহিত কতকগুলি অতি জটিল ও দুর্জ্ঞেয় রহস্যের উদ্ঘাটনের প্রয়াস পাইয়াছি।

আমাদের এই যুগ বিশ্বাসের যুগ নহে। বিজ্ঞানের যুগ, তর্কের যুগ, সংশয় সন্দেহের যুগ। বহু বহু কাল পূর্ব্বে, কবি যে সকল কাল্পনিক চিত্র চিত্রিত করিয়া গিয়াছেন। বহু বহু কাল পূর্ব্বে, দার্শনিক যে সকল সত্যের অবতারণা করিয়া সাধারণ্যে উপহসিত ও নির্য্যাতিত হইয়াছেন। বহু বহু কাল পূর্ব্বে, বৈজ্ঞানিক যে সমস্ত শক্তির সত্বার কথা প্রচারিত করিতে গিয়া বাতুল অথবা বুজরুক্ সপ্রমাণিত হইয়া আমরণ অন্ধতমসাচ্ছন্ন কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইয়াছেন ও অনশনে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন, অথবা শক্তিমান রাজার কোপে পড়িয়া বিষপ্রয়োগে নিহত হইয়াছেন। কিম্বা জ্বলন্ত চিতায় দগ্ধ হইয়াছেন। এখন জ্ঞানের বিকাশ ও স্ফুর্ত্তির সঙ্গে সঙ্গে সেই সমস্ত কাল্পনিক তথ্যের সত্যতা আমরা প্রতি মুহুর্ত্তে উপলব্ধি করিতে পারিতেছি। দশরথের শব্দভেদী বাণ, দশাননের গগণবিহারী বিমান, শতক্রতুর সৃষ্টি-বিধ্বংসী বজ্রায়ুধ, এখন আর কল্পনা-স্বপ্ন বলিয়া উপহসিত হয় না। সূর্য্য পৃথিবীকে আবর্ত্তন করিয়া ঘুরিতেছেন না। পৃথিবীই সূর্য্যকে আবর্ত্তন করিতেছে। এই কথা উচ্চকণ্ঠে প্রচার করিলেও আজ আর বৈজ্ঞানিককে হেমলক্ বিষপানে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিতে হয় না। কিন্তু

পরিতাপের বিষয় এই যে, আধুনিক যুগে, জ্ঞানের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে অবিশ্বাস ও সন্দেহের মাত্রাও বাড়িয়া উঠিয়াছে। কোনও দার্শনিক চীৎকার করিয়া বলিতেছেন "ঈশ্বর নাই। কারণ, তাঁহার অস্তিত্বের কোন প্রমাণ নাই।" কোন তাত্ত্বিক বলিতেছেন "সৃষ্টি আছে—স্রষ্টা নাই। এই বিশ্বপিণ্ড আণবিব সংঘাত-সঞ্জাত।" একজন নৈয়ায়িক বলিতেছেন "আত্মা অবিনশ্বর নহে। শরীরের সহিত আত্মার বিলয় অবশ্যম্ভাবী। আর এক জন বলিতেছেন "যাহাকে তোমরা আত্মা বলিতেছ। তাহা পঞ্চভূতাত্মিকা জীবনীশক্তি মাত্র। মৃত্যুর মুহূর্ত্তেই জীবাত্মা দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন হয়। ও ভূতগণ পঞ্চভূতে বিলীন হয়। আত্মার ক্ষিত্যংশ ক্ষিতিতে মিশে। জলীয়াংশ সলিলে লীন হয়। তেজ তেজে, বায়ু বায়ুতে ও আকাশ আকাশে মিলাইয়া যায়। প্রদীপ জ্বালাইয়া দাও জ্বলিবে। নিভাইয়া দাও নিভিয়া যাইবে। দীপ নিভিয়া গেলে আর আলোকের সত্বা কোথায় রহিল? এই দীপ-শিখাটিকে অবিনশ্বর বলা কি বাতুলতা নহে? দীপশিখার সহিত দীপের যে সম্বন্ধ, আত্মার সহিত দেহের সম্বন্ধও ঠিক তদনুরূপ।"

এই সকল মনীষাশালী মহাত্মাদিগকে যদি তুমি বল যে, "ভাল! ঈশ্বর নাই থাকুন, স্রষ্টা নাই থাকুন, আত্মা

অবিনশ্বর নাই হউক, জগৎ সৃষ্ট হইল কেন? ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্ট হইল কি জন্য? আমরা জন্মি কেন? বাঁচিয়া থাকি কেন? আবার মরিয়াই বা যাই কেন?"

এই জটিল "কেন" প্রশ্নটীর মীমাংসা তর্ক বা গবেষণার অতীত। বিশ্বাস-বলে ইহা সাধ্য। বিশ্বাসের সাহায্যে ইহা প্রতিপাদ্য। ইহাই আমার ধারণা।

"জন্ম কর্ম্ম চ মে দিব্যং যো বেত্তি তত্ত্বতঃ।
ত্যক্ত্বা দেহং পুনর্জন্ম নৈতি নামেতি সোঽর্জ্জুন ॥"

গীতা ৪ অং, ৯ শ্লোক।

শশাঙ্ক মোহন সেন, বি-এল্

কুন্তলীন প্রেস, কলিকাতা।

মণিমালা।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

নলিনীনাথ উর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়া গিয়া ডাক্তারের বাড়ীতে উপস্থিত হইলেন। বাড়ীর ফটক তখনও বন্ধ। নলিনীনাথ কাতরভাবে চীৎকার করিয়া ডাকিতে লাগিলেন "ডাক্তার বাবু! ডাক্তার বাবু!"

রসময় লাহিড়ী সেকেলে ক্যাম্পবেলে পাশ করা ডাক্তার। স্কুল ছাড়িয়াই তিনি সরকারী চাকরীতে প্রবেশ করেন। খোসামুদী ও অদৃষ্ট উভয়ের জোরে, তিনি পদোন্নতির চরমোৎকর্ষ লাভ করিয়া, জীবনের তিন কুড়ি বৎসর পাছে ফেলিয়া, চাকরী হইতে অবসর গ্রহণ করিলেন।

ডাক্তার বাবু বিপত্নীক। সংসারে তাঁহার আপনার বলিতে আর কেহই ছিল না। ছিল কেবল একটি ষোড়শ-বর্ষীয়া কন্যা। তাহার নাম ছিল প্রভা।

মণিমালা।

চাকরী ছাড়িয়া ডাক্তার বাবু তাঁহার দেশের পৈত্রিক ভিটা ও বিষয় সম্পত্তি যাহা ছিল, সমস্ত বিক্রয় করিয়া সেই বিক্রয়লব্ধ অর্থে, তাঁহার কোম্পানির কাগজের তাড়া আরও বাড়াইয়া লইয়া, স্বাস্থ্যাবাস মধুপুরের উপকণ্ঠে একখানি ক্ষুদ্র বাগানবাটী ক্রয় করিয়া, সেই খানেই বাস করিতে লাগিলেন।

রসময় বাবু স্বভাবতঃ একটু কৃপণ ছিলেন। তাঁহার বাড়ীতে একটিমাত্র ভৃত্য ছিল। পাচকের কার্য্যও সে-ই করিত। অন্য লোকজন তিনি রাখিতেন না।

বিবাহের বয়স পার হইয়া গেলেও, রসময় বাবু কন্যার বিবাহ সম্বন্ধে বড়ই উদাসীন ছিলেন। কোথা হইতে একজন অপরিচিত লোক, সমাজের একটা খাম্-খেয়ালীতে, উত্তরাধিকার-সূত্রে তাঁহার শ্রমলব্ধ ও যত্নপুষ্ট অর্থস্তূপের উপর উড়িয়া আসিয়া জুড়িয়া বসিবে, এই কল্পনাও তাঁহাকে সূচীভেদ যন্ত্রণা দিত।

প্রতীচ্যে যে বহু নারী চিরকুমারীই থাকে। তাহাদের সমাজ কি সমাজ নয়? তাহাদের ধর্ম্ম কি ধর্ম্ম নয়?

প্রথম পরিচ্ছেদ।

পারৎপক্ষে কন্যার বিবাহ দিব না, ইহাই ছিল ডাক্তার বাবুর মনোগত বাসনা। শৈশবে মাতৃহীনা বালিকা প্রভাও, পিতার সেবায় প্রাণ ঢালিয়া দিয়া, সংসারের আর সব ভুলিয়া গিয়াছিল।

নলিনীনাথ যখন হাঁপাইতে হাঁপাইতে আসিয়া কাতর-কণ্ঠে ডাক্তার বাবুকে ডাকিতেছিলেন, প্রভা তখন বাটীর সম্মুখস্থ উদ্যানে পুষ্পচয়ন করিতেছিল। সে মুখ তুলিয়া নলিনীনাথের দিকে চাহিল। নলিনীনাথ ব্যস্তভাবে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন "ডাক্তার বাবু বাড়ীতে আছেন কি?"

প্রভা উত্তর দিতে যাইবে, এমন সময় ডাক্তার বাবু বাহির হইয়া আসিয়া রুক্ষভাবে কহিলেন "কে তুমি? কি চাও?"

ডাক্তার বাবু মোটাসোটা, খর্ব্বাকৃতি। মাথায় প্রকাণ্ড টাক। মুখখানি সম্পূর্ণরূপে আবৃত করিয়া, লম্বা পাকা গোঁফ দাড়ি। চোখে লোহার ফ্রেমের চসমা। পরিধানে থান কাপড়। তাঁহার দক্ষিণ হস্তে একটি স্থানে স্থানে চটা-ওঠা এনামেলের চায়ের বাটি। তাহার রং নীল।

বাম হস্তে একখানি সসার্ (চায়ের বাটি-রাখা রেকাবি)। সেখানির রং সাদা।

নলি। আপনি?—আপনিই কি ডাক্তার বাবু? আপনাকে একবার আমাদের বাড়ী যেতে হবে। আমার মায়ের আসন্নকাল উপস্থিত।

রস। কি রোগ?

নলি। জ্বর-অতিসার। তাঁর বয়স হয়েছে।

রস। তোমাদের বাড়ীটা কতদূর?

নলি। বেশী দূর নয়। ওই মোড়ের উপর।

রস। তোমরা কি জাত?

নলি। ব্রাহ্মণ—আমরা বারেন্দ্র।

রস। তোমাদের দেশ?

নলি। পাবনা।

রস। এখানে কেন?

নলি। হাওয়া পরিবর্ত্তন করতে আসা।

রস। তুমি কি কর?

নলি। এম্ এ, পড়ি।

রস। দেশে জমাজমী কিছু আছে?

নলি। আছে, অল্প স্বল্প?

রস। সম্পত্তির আয় কত?

নলি। আমার মা একজিকিউট্রিক্স। আমি অত খোঁজ-খবর রাখিনি।

রস। সে কি হে! অতবড় ধেড়ে হয়েছ। সম্পত্তির আয় কি, সে খোঁজটাও রাখ না। এখনকার ছেলেপিলেই হয়েছে ঐ রকম।

যত সময়ক্ষেপ হইতেছিল নলিনীনাথের উৎকণ্ঠা ততই বাড়িতেছিল। আবার নলিনীনাথ যত উৎকণ্ঠিত হইতেছিলেন, কি জানি প্রভাও কেন তাহার হৃদয়ে একটা দারুণ উৎকণ্ঠার যন্ত্রণা ভোগ করিতেছিল। সমান সুরে বাঁধা দুইখানি বাদ্যযন্ত্রের একখানিতে ঝঙ্কার দিলে যেমন অন্যখানিও বাজিয়া উঠে, সমান সমান তড়িচ্ছক্তি সম্পন্ন দুইটি হৃদয় সম্বন্ধেও সেই নিয়ম। তাহাদের একের স্পন্দনে অপরের স্পন্দন অনিবার্য্য।

নলিনীনাথের ঔৎসুক্য ও উৎকণ্ঠা দেখিয়া, বৃদ্ধ দুঃখিত হওয়া দূরে থাক, বরং মনে মনে আনন্দ অনুভব করিতে লাগিলেন। পরে একটু কুটিল হাসি হাসিয়া কহিলেন

"আমার ফি-টা কত জানা আছে তো? ষোল টাকা। তার কমে আমি কোথাও যাই না।"

নলি। তাই দিব। আপনি একটু শীঘ্র চলুন্।

রস। ফি-টা সঙ্গে আছে কি?

নলি। আমি তাড়াতাড়িতে টাকা আনিতে ভুলিয়া গিয়াছি। আমাদের বাড়ী গিয়ে নেবেন এখন।

রস। সে কি হয়? আমাদের ব্যবসা। ধর যদি তোমার মা মারাই গিয়ে থাকেন। তা হ'লে তো তুমি গিয়েই, মাথায় হাত দিয়ে, কাঁদতে বস্‌বে। আমার ফি-টা তা হ'লে তো মাঠে মারা যাবে।

নলি। এখন বাড়ী গিয়ে টাকা আনতে গেলে অনেক দেরী হয়ে পড়্‌বে। আচ্ছা, যদি আপনার অবিশ্বাস হয়, তা হ'লে এই বোতামসেট্‌টি না হয় আপনার কাছে রাখুন্। তার পরে, আপনার প্রাপ্য টাকা পেলে, আপনি এগুলি ফেরত দিবেন।

পিতার এই অসামাজিকতা, অবিশ্বাস ও অর্থগৃধ্নুতা-সূচক কথাবার্ত্তা শুনিয়া প্রভা মর্ম্মপীড়িত হইতেছিল। সে এক একবার তাহার পিতার দিকে রুষ্টভাবে ও

নলিনীনাথের দিকে দীননেত্রে চাহিতেছিল। তাহার পিতার কথাবার্ত্তা ক্রমে শিষ্টতার সীমা অতিক্রম করিয়া যাইতেছে দেখিয়া, সে আর থাকিতে না পারিয়া কহিল "বাবা! আপনি ওঁকে অবিশ্বাস করছেন কেন? আপনি যান। বাড়ীতে গিয়ে উনি নিশ্চয় আপনাকে টাকা দিবেন।"

ডাক্তার বাবু কন্যাকে ধমক দিয়া কহিলেন "তুই চুপ্ করে থাক্। তোকে কর্ত্তাত্বি করতে হবে না।"

প্রভা। না বাবা! আমি কিছুতেই তোমাকে ওঁর বোতাম নিতে দিব না।

রস। না! তা নিতে দেবে কেন?

নলিনীনাথ ততক্ষণে তাঁহার সার্ট হইতে বোতামগুলি খুলিয়া ফেলিয়াছিলেন। সেগুলি ডাক্তার বাবুর হাতে দিতে যাইবেন, এমন সময় প্রভা অগ্রসর হইয়া, হাত পাতিয়া কহিল "দিন্—আমাকে দিন্।"

নলিনীনাথও যন্ত্র-পরিচালিতের ন্যায় বোতামসেটটি প্রভার হাতে দিলেন। হৃদয়ে কোনওরূপ উদ্বেগ অথবা আবেগ থাকিলে, হস্তপদের সঞ্চালন একটু অসংযত হইয়া

উঠে। প্রভার হাতে বোতামসেট্‌টি দিতে গিয়া, তাহার চম্পক কোরক সদৃশ ঈষৎ কম্পিত অঙ্গুলিতে, নলিনীনাথের অঙ্গুলি স্পৃষ্ট হইল। তড়িচ্ছক্তিপূর্ণ দুইটি তড়িদ্বহা সূত্র যেমন পরস্পর স্পৃষ্ট হইলে নিমেষ মধ্যে একটি তীব্র জ্বালা, আন্দোলন ও কম্পন অনুভূত হয়, নলিনীনাথ ও প্রভা উভয়েই তাহাদের নিজ নিজ হৃদয় মধ্যে সেইরূপ অভূত-পূর্ব্ব হর্ষ অনুভব করিলেন। ইহারই নাম কি ভালবাসা ?

বৃদ্ধ রসময় ডাক্তার কিন্তু তাঁহার কন্যার এই ভাবান্তর লক্ষ্য করিতেছিলেন না। অর্থগৃধ্নু কৃপণের লোলুপ দৃষ্টি তখন প্রভার হাতে নলিনীনাথের সেই উজ্জ্বল মূল্যবান সুবর্ণময় বোতামসেট্‌টির দিকে।

ডাক্তার বাবু কন্যাকে একটু চোখ টিপিয়া কহিলেন "আচ্ছা—প্রভা! তোর কাছেই এখন বোতামসেট্‌টা রেখে দে। খুব্‌ সাবধানে রাখিস্‌। পরের জিনিস যেন হারিয়ে ফেলিস্‌নি। যাই—আমি এখনই কাপড় ছেড়ে আসি গিয়ে।"

ডাক্তার বাবু বেশ পরিবর্ত্তন করিতে গেলেন। প্রভা আস্তে আস্তে নলিনীনাথের কাছে আসিয়া লজ্জায় অবনত-

মুখে কহিলেন "মহাশয়! আপনার বোতাম কয়টি লউন্। এখন পরিবেন না। আপনার পকেটে রাখিয়া দিন্।"

নলিনীনাথ একটু কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া রহিলেন প্রভা কহিল "আপনি বোতামগুলি না লইলে আমি অত্যন্ত দুঃখিত হইব।"

কি জানি কেন, নলিনীনাথ প্রভার অনুরোধ এড়াইতে পারিলেন না। প্রভার হাত হইতে তিনি বোতামসেট্‌টি লইলেন। আবার সেই সংস্পর্শ! আবার সেই ভাবাবেশ!

ডাক্তারবাবু কাপড় ছাড়িয়া আসিবামাত্র নলিনীনাথ তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া ব্যস্তভাবে বাহির হইয়া গেলেন। কি এক অজানিত আকর্ষণী শক্তি যেন তাঁহাকে পশ্চাতে টানিয়া ধরিয়া রাখিবার চেষ্টা করিতে লাগিল।

প্রভাও যতক্ষণ দৃষ্টি চলে, নির্ণিমেষ নেত্রে নলিনীনাথকে দেখিতে লাগিল। আর মনে মনে ঈশ্বরকে ডাকিতে লাগিল "ঠাকুর! এই ভদ্রলোকের মাতাকে রোগমুক্ত করুন্।"

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

নলিনীনাথ ডাক্তার লইয়া বাড়ীতে আসিয়াই দেখিলেন যে, বৃদ্ধ ভগবান দেওয়ান বৈঠকখানার দ্বারে দাঁড়াইয়া তাঁহারই আগমন প্রতীক্ষা করিতেছে। বৃদ্ধের জাগরণ-ক্লিষ্ট কোটরগত চক্ষুর্দ্বয় রোদনারুণিত। তাহার শীর্ণ কপোল দুইটি অশ্রুকলাঙ্কিত।

নলিনীনাথ দেওয়ানজীকে দেখিয়া উৎসুক ভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন "মায়ের অবস্থা এখন কেমন, দেওয়ানজী?"

কোঁচার খুঁটে চোখ মুছিতে মুছিতে ভগবান দেওয়ান উত্তর দিল "অবস্থা ভাল নয়। আপনি একবার শীঘ্র ভিতরে চলুন্।"

নলিনীনাথ ছুটিয়া মায়ের শয়নকক্ষে গেলেন। রসময় ডাক্তার তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গেলেন।

নলিনীনাথের মাতা একখানি পর্য্যঙ্কে শয়ন করিয়া মরণ-যন্ত্রণায় এপাশ-ওপাশ ও ছট্‌ফট্ করিতেছেন। একজন দাসী তাঁহার পার্শ্বে বসিয়া পরিচর্য্যা করিতেছে। পুত্রকে দেখিয়াই মাতা যেন একটু আশ্বস্ত হইলেন। হাত নাড়িয়া

তাঁহাকে তাঁহার কাছে আসিয়া বসিতে ইঙ্গিত করিলেন। পরে ধীরে ধীরে কহিলেন "নলিন্! আমি যে তোকে দেখবার জন্য ছট্‌ফট্ করছিলাম। তুই কোথায় গিয়েছিলি, বাবা ?"

"মা! আমি ডাক্তার বাবুকে ডেকে আন্‌তে গিয়েছিলাম। এই যে তিনি এসেছেন।"

"ডাক্তারে আমার আর কি প্রয়োজন, বাবা? আমার শেষ সময় উপস্থিত। এখন দয়াময় শ্রীহরিই আমার ডাক্তার। তাঁর নামামৃতই আমার ওষুধ।"

"না মা! তুমি মরবে না। তুমি অসুস্থ হয়েছমাত্র। ওষুধ খেলেই তোমার অসুখ সেরে যাবে।"

"বাবা! আমি অনেকক্ষণ চলে যেতাম। কেবল একটি কথার জন্য, আমি যেতে পারিনি। আমার মুখে একটু গঙ্গাজল দাও।"

নলিনীনাথ একখানি ক্ষুদ্র তাম্র নির্ম্মিত কুষীতে করিয়া তাঁহার মায়ের মুখে একটু গঙ্গাজল দিলেন। মাতা আবার বলিতে লাগিলেন "নলিন! আমার বালিশের নীচে একতাড়া চাবি আছে। তাহাই লইয়া ঐ লোহার সিন্দুকটি

খোল। সিন্দুকের কোণে একটি রূপোর বাক্স দেখতে পাবে। ঐ বাক্সটি এখানে নিয়ে এস।"

নলিনীনাথ যথাযথ তাঁহার মাতার নিদেশ পালন করিলেন।

নলিনীর মাতা কহিলেন "বাছা নলিন! এই বাক্সটি অতি যত্নে রাখিবে। ইহার মধ্যে দেবাদিদেব পশুপতি-নাথের নির্ম্মাল্য ও একছড়া মুক্তার মালা আছে। ঐ মুক্তার মালায় একখানি বিচিত্র অষ্টধাতু নির্ম্মিত নবরত্নের পদক আছে। উহা একজন সন্ন্যাসী দত্ত। তুমি এই মালাছড়াটি সর্ব্বক্ষণের জন্য গলায় পরিয়া থাকিবে। তাহা হইলে কোন বিপদ আপদ তোমাকে স্পর্শ করিতে পারিবে না।"

নলিনীনাথ কাঁদিতে লাগিলেন। তাঁহার মাতা তাঁহাকে আশ্বাস দিয়া কহিলেন "বাছা! কেঁদো না। আমার সময় হইয়াছে। আমি তোমাদের রাখিয়া, সচ্চিদানন্দের চরণ পূজা করিতে আনন্দময় ধামে যাচ্ছি। এতে দুঃখ কি, নলিন?" নলিনীনাথের মায়ের অপাঙ্গকোণে দুই বিন্দু অশ্রু উদগত হইয়া, তাঁহার শীর্ণ কপোল বহিয়া

পড়িয়া গেল। নয়নদ্বয় নিমীলিত হইয়া আসিল। শ্বাস প্রশ্বাস মৃদুতর হইতে লাগিল। ভগবান দেওয়ান কাঁদিতে কাঁদিতে কহিল "মায়ের অন্তিমকাল উপস্থিত। আসুন্, ধরাধরি করিয়া বাহিরে লইয়া যাই। অন্তর্জলী করিতে হইবে।"

ভগবান দেওয়ান উচ্চকণ্ঠে হরিনাম করিতে লাগিল। পরমমঙ্গলময়ের নাম শুনিতে শুনিতে নলিনীর মাতা ইহলোক ছাড়িয়া গেলেন। ভগবান দেওয়ান ডাক ছাড়িয়া কাঁদিয়া উঠিল "আজ জগদিন্দ্রনাথের গৃহ হইতে দেবী অন্নপূর্ণা অন্তর্হিত হইলেন।"

ডাক্তারবাবু চমকিয়া উঠিয়া কহিলেন "জগদিন্দ্রনাথ! কোন্ জগদিন্দ্রনাথ?"

ভগ। পাবনার জমীদার।

ডাক্তা। নলিনী জগদিন্দ্র বাবুর পুত্র?

ভগ। আজ্ঞে! উনিই তাঁহার একমাত্র বংশধর।

ডাক্তা। আমি যখন পাবনায় এসিষ্টাণ্ট সার্জ্জন ছিলাম, তখন জগদিন্দ্র বাবুর সহিত আমার বিশেষ ঘনিষ্ঠতা ছিল। সে আজ প্রায় ত্রিশ বৎসরের কথা।

তখন তাঁহার সন্তানাদি হয় নাই। যাহা হউক, যখন জানা শুনা হ'ল, তখন আমাকে মাঝে মাঝে এসে দেখাটা শুনাটা করতে হবে।

ভগ। তা কর্‌বেন বই কি? দাদাবাবু নিতান্ত ছেলে মানুষ। আপনাদের মত একজন বিজ্ঞ অভিভাবকের তত্ত্বাবধানে থাকা, তাঁর বিশেষ প্রয়োজন।

ডাক্তার বাবু নলিনীকে কাঁদিতে দেখিয়া সান্ত্বনা দিয়া কহিলেন, "ছিঃ, কেঁদো না। কাঁদ্‌লে তো আর মাকে ফিরে পাবে না। এখন যাও—অন্ত্যেষ্টির জোগাড় কর গিয়ে। আমিও এখন উঠি। বেলা অনেকটা হয়েছে। প্রভা একলা রয়েছে।"

নলিনীনাথ কাঁদিতে কাঁদিতে মুখ তুলিয়া কহিলেন, "আপনার ফি-টা।"

ডাক্তারবাবু আম্‌তা-আম্‌তা করিতে লাগিলেন। নলিনীনাথ উঠিয়া গিয়া একটি আলমারির ড্রয়ার খুলিয়া, তাহা হইতে পাঁচখানি দশ টাকার নোট লইয়া ডাক্তার বাবুর হস্তে দিলেন। ডাক্তারবাবু অম্লান বদনে নোটগুলি পকেট-জাত করিয়া ধীর পাদবিক্ষেপে তথা হইতে অন্তর্হিত হইলেন।

যাইবার সময়, মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, "ছেলেটা কি অমিতব্যয়ী! হাতে পড়িলেই দুই দিনে সে তাহার সমস্ত সম্পত্তি উড়াইয়া পুড়াইয়া দিবে।"

নলিনীনাথ যে একখানি গলিত সুবর্ণপূর্ণ স্পঞ্জ—তাহাকে হাতে রাখিতে পারিলে যে সমূহ লাভ, এই ধারণা ডাক্তার বাবুর মস্তিষ্কে দৃঢ়ভাবে বদ্ধমূল হইয়া গেল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

এদিকে পিতার ফিরিতে যত বিলম্ব হইতে লাগিল, প্রভাও ততই উদ্বিগ্ন হইতে লাগিল। নানারূপ চিন্তা আসিয়া তাহার কৈশোর হৃদয়খানিকে আলোড়িত করিয়া তুলিল। প্রভা, নলিনীনাথের মাতার রোগ নিরাময় কামনায় ঠাকুরের নিকট কত কি মানৎ করিল। তাহার পিতার ঔষধেই যেন নলিনীনাথের মাতা ব্যাধিমুক্তা হন। নলিনীনাথ তাহা হইলে নিশ্চয়ই তাহাদের নিকট কৃতজ্ঞ রহিবেন। তাহাতেই প্রভার সুখ। তাহাতেই প্রভার আনন্দ।

প্রভা ঔৎসুক্যে দগ্ধ হইতে লাগিল। সে আর থাকিতে পারিল না। একবার লোক পাঠাইয়া নলিনীনাথের মাতার সংবাদ লইবার জন্য তাহার হৃদয়ে প্রবল ইচ্ছা জন্মিল। সে তাহাদের ভৃত্য হলধরকে পাঠাইবার উদ্যোগ করিতেছে, এমন সময় ডাক্তার বাবু আসিয়া সংবাদ দিলেন যে নলিনীর মাতা মারা গিয়াছেন। প্রভা সে সংবাদে বড়ই ব্যথিত হইল। কে জানে কেন এই অজানিত অপরিচিত পরিবারে একটি

সাধারণ আপৎপাতের সংবাদে প্রভার হৃদয়ে নিদারুণ ব্যথা বাজিল। নিজের কক্ষে গিয়া, দ্বার রুদ্ধ করিয়া প্রভা কতই কাঁদিল। কেন যে কাঁদিল, সে নিজেই তাহা বুঝিল না।

বেলা এগারোটা বাজিয়া গেল, প্রভা তখনও স্নান করে নাই। ডাক্তার বাবু স্নান করিয়া প্রভার কক্ষে আসিলেন। প্রভাকে দেখিয়া তিনি চমকিয়া উঠিলেন। ব্যাপার বুঝিতে তাঁহার আদৌ বিলম্ব হইল না। যেন কিছু বুঝিতে পারেন নাই, এইরূপ ভান করিয়া ডাক্তারবাবু কহিলেন "প্রভা! এখনও স্নান করিলে না যে, মা!"

প্রভা। আমার শরীরটা কেমন ম্যাজ্‌ম্যাজ্ করছে।

ডাক্তার। দেখি! তোর হাতটা একবার দেখি।

প্রভা হাত বাড়াইয়া দিল। ডাক্তার বাবু নাড়ী টিপিয়া দেখিলেন, কিছুই নহে। কেবল অত্যধিক আবেগে নাড়ীর গতি একটু চঞ্চল, প্রবল ও উত্তেজিত। ডাক্তার বাবু বুঝিলেন, রোগ কি? ইহাও বুঝিলেন যে এ রোগের ঔষধি তাঁহার ব্রিটিশ ফার্ম্মাকোপিয়ায় নাই। কন্যার এই মানসিক বিকার দেখিয়া কৃপণ রসময় ডাক্তার কিছুমাত্র

দুঃখিত হইলেন না। বরং আনন্দিত হইলেন। কন্যারূপ বড়শী ফেলিয়া ধনী যুবক নলিনীকে আটকানো অতি সহজ হইবে, এই ভাবিয়া বৃদ্ধের আর আনন্দের সীমা রহিল না।

পিতার আগ্রহাতিশয্যে প্রভা ধীরে ধীরে শয্যা পরিত্যাগ করিয়া উঠিল। তাহার মন তখনও বিক্ষিপ্ত। কি এক অজানিত ব্যাকুলতায় তাহার হৃদয় তখনও আকুলিত।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

নলিনীনাথের চেহারায় ও প্রকৃতিতে মুগ্ধ হইয়াছিল প্রভা। আর তাহার অগাধ সম্পত্তি ও ঐশ্বর্য্য দেখিয়া লুব্ধ হইয়াছিলেন ডাক্তার রসময়।

ডাক্তারের এখন শয়নে স্বপনে একমাত্র চিন্তা—কেমন করিয়া তিনি নলিনীর সেই অগাধ সম্পত্তি হাত করিবেন। এই ভাবনাতেই বৃদ্ধ পাগলের মত হইয়া উঠিলেন। তিনি সমস্ত রাত্রি বিছানায় পড়িয়া ছট্‌ফট্‌ করিতে লাগিলেন। একে নিদ্রাল্পতাই বার্দ্ধক্যের স্বাভাবিক ধর্ম্ম। তাহাতে আবার হৃদয়ে দুরাকাঙ্ক্ষা ও দুশ্চিন্তার তীব্র কালকূট। বৃদ্ধ সমস্ত রাত্রির মধ্যে একবারও চোখ বুজিতে পারিলেন না।

অতি প্রত্যূষে শয্যা ত্যাগ করিয়াই ডাক্তার বাবু চিন্তিত-ভাবে বারান্দায় পাইচারি করিতে করিতে উচ্চৈঃস্বরে ভৃত্যকে ডাকিলেন "হলা!" কোনও উত্তর পাইলেন না। বিরক্তভাবে স্বর আরও একটু উচ্চ করিয়া আবার ডাকিলেন। ডাক এবার ভৃত্য হলধরের কাণে পৌঁছিল। শয়ান অবস্থাতেই হলধর উত্তর দিল "আজ্ঞে যাই!"

এই বলিয়া পাশ ফিরিয়া শুইয়া সে আবার নাক ডাকাইতে আরম্ভ করিল। দশ পোনের মিনিট হলধরের আগমন প্রতীক্ষায় থাকিয়া থাকিয়া ডাক্তারবাবুর যথার্থ ই ধৈর্য্যচ্যুতি হইল। হলধরের অভৃত্যজনোচিত ব্যবহারে সাতিশয় রুষ্ট হইয়া ডাক্তার বাবু গরগর করিতে করিতে নিম্নতলে নামিয়া একেবারে হলধরের ঘরে গিয়া মুখ বিকৃত করিয়া কর্কশ স্বরে কহিলেন "আটকুড়োর সন্তান! কেবল রাশ্ রাশ্ গিল্বেন, আর বেলা দুকুর অবধি নাক ডাকিয়ে ঘুমুবেন। ওঠ্ বল্ছি এক্খুনি।"

"আজ্ঞে, উঠেই তো আছি। উঠিনি তো, ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে কি কেউ সাড়া দিতে পারে?"

"ব্যাটার কাজের সঙ্গে খোঁজ নেই, কেবল বাক্যি।"

"আজ্ঞে, এই যে সংসারের কাজগুলো সব, একি আপনি আপনি হচ্ছে? না ভূতে এসে করে দিয়ে যাচ্ছে? না আর পাঁচটা চাকর-চাকরাণী আপনার বাড়ীতে আছে, তারাই করছে।"

"রাখ, রাখ, বাক্যি রাখ্। এখন চট্ করে চা-টা তৈরি করে নিয়ে আয়।"

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

"আজ্ঞে, চা তো তৈরিই আছে। কেবল দুটো শুক্‌নো খড়কুটো জ্বালিয়ে একটু গরম করে ঢেলে দেবার ওয়াস্তা।"

"চা তৈরি কি রে? চা কখন্ তৈরি করলি? তুই তো ঘুমুচ্ছিলি।"

"আজ্ঞে, রাত্রেই যে ওকাজটা এগিয়ে রেখে দি।"

"ওরে হতভাগা! রোজ রোজ আমাকে বাসি চা খাওয়াস্!"

"আমার কি? আপনারই খরচা কমাবার জন্যে। কয়লা, ঘুঁটে, দেশলাই, এসব ডবল্ ডবল্ খরচা যদি করতে চান, কাল থেকে আপনাকে টাট্‌কা চা-ই খাওয়াব।"

"বেটা! বাসি চা আমাকে বল্লি কেন? খেতে তো মন্দ হয় না। তুই বাসি চা-ই রাখিস্। টাট্‌কায় আর কাজ নেই। চা-টা বাসিই উপকারী। ওতে চায়ের ট্যানিন্‌টা উবে গিয়ে, চায়ের দোষটা কাটিয়ে দেয়। তা হ'লে, আমি ওপরে যাই। তুই চা নিয়ে আয়।"

"যে আজ্ঞে, হুজুর!"

ডাক্তার বাবু উপরে গিয়া বারান্দায় পাইচারি করিতে লাগিলেন। হলা চা গরম করিয়া চটা-ওঠা এনামেলের

বাটিতে ঢালিয়া আনিয়া, বাটিটা একখানি জীর্ণ টিপয়ের উপর রাখিয়া দিল।

বদ্ধ চা-খোরের মত তৃপ্তভাবে চায়ের রসাস্বাদন করিতে করিতে ডাক্তার বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন "আরে হলা! আজ চায়ে দুধ কম ঠেক্‌ছে কেন?"

"আজ্ঞে, কম একটু ঠেকতেই তো পারে হুজুর! ওতে দুধ যে মোটে দিইনি।"

"কেন রে হতভাগা! বিনা দুধে চা করেছিস?"

"দুধ পাব কোথায় যে দিব। আপনি তো শুধু শুধু রাগ করেন।"

"কেন—ছাগল?"

"ছাগল কি দুধ দিচ্ছে?"

"কেন দেবে না? পয়সা দিয়ে ছাগল কিনেছি। দুধ দেবে না? তার বাবা যে সেই দেবে।

"আপনি যে আর বাচ্চা দুটোকে কাল দেড় টাকায় বেচে দিলেন।"

"বাচ্চা নাই বা রইলো। তুই টেনে দুইলিনি কেন?"

"বাঁটে কি হাত দিতে দিচ্ছে, যে টেনে দুইবো?"

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

"তা যাক্‌গে মরুক্‌গে। এই বিনাদুধে রাসিয়ান্ টি-টা খুব উপকারী। এতে হজমশক্তি বাড়ায়। ডাক্তার মেচ্‌নিকফের মতে, বিনাদুধে রাসিয়ান টি, আর ঘরে পাতা দই, দুইয়েরই গুণ ঠিক সমান। আজকের চা-টা একটু টক্‌টক্ লাগছে কেন রে হলা?"

"তা একটু লাগবে হুজুর! ওটা ডাক্তার হেঁচ্‌কি-কফের মতে তৈরি হয়েছে। শুক্‌নো হ'লেও তেঁতুলপাতার টক-রসটা যাবে কোথায়?"

"তেঁতুলপাতা কিরে, আঁটকুড়োর সন্তান?"

"আজ্ঞে, ওটাও আপনারই খরচা সংক্ষেপ করবার জন্যে। তেলের সঙ্গে সোরগোঁজা চলে যাচ্ছে। ঘিয়ের সঙ্গে চীনে বাদামের তেল বেমালুম চলে যাচ্ছে। আর চায়ের সঙ্গে তেঁতুল পাতাটা চল্‌তেই যত দোষ? ওটা আমি মাথা খেলিয়ে বের করেছি হুজুর! ওতে চায়ের সোয়াদটাকে একটু রকমারি করে। অথচ খরচার বেলায় একেবারে দশ-আনা ছ-আনা। দরকার হলে সাড়ে পনর-আনা, আধ-আনাও পড়্‌তা ফেলা যায়।"

প্রকৃত নিমকের চাকর হলধরের গুণপণায় ও তাহার

এই অদ্ভুত সর্ব্বতোমুখী প্রতিভার নবনবোন্মেষকারিণী শক্তি দেখিয়া বিস্মিত হইয়া ডাক্তারবাবু কহিলেন "হলু! বাপ আমার! আজ থেকে আর চা একেবারেই কিনো না। বিশুদ্ধ তেঁতুল পাতার ট্যানিন্-বিবর্জ্জিত ও সাইট্রিক-এসিড-পূর্ণ চা-ই আমি কাল থেকে খাবো।"

হাত কচ্‌লাইতে কচ্‌লাইতে হলধর কহিল "দেখুন্ হুজুর! আমার মাথাটা কেমন সাফ্! থেকে থেকে কেমন জিনিসটা বের করেছি!"

ডাক্তার বাবু কহিলেন "দিব্বি জিনিস্! বেড়ে জিনিস্! বাঃ-বাঃ—হলধর! বেশ! বেশ!" ডাক্তার বাবু এইরূপে হলধরের বুদ্ধির প্রশংসা করিতে করিতে তাঁহার পেয়ালার সবটুকু তেঁতুলপাতা-সিদ্ধ জলই উদরস্থ করিয়া ফেলিলেন।

চা পান শেষ করিয়া ডাক্তার বাবু আবার একাকী চিন্তিত ভাবে বারান্দায় পরিক্রমণ করিতে করিতে অস্ফুট স্বরে কহিতে লাগিলেন "আচ্ছা! এক কাজ করি। কোনও রকমে কৌশল করে, কোন অছিলায়, এই বাড়ী ছেড়ে দিয়ে, কয়েক দিনের জন্য, প্রভাকে সঙ্গে নিয়ে নলিনীর বাড়ীতে গিয়ে বাস করি। তার পরে, প্রভার

সঙ্গে নলিনীর একটু ভাব সাব্ হয়ে গেলে, তখন প্রভাকে দিয়ে, ওর বিষয়-আষয়ের দলিল পত্রগুলি, টাকা পয়সা হীরে জহরৎ কোম্পানীর কাগজ ওর যা কিছু আছে, সবগুলি হাত্ করে নিয়ে, তারপর একদিন খাবারের সঙ্গে, একটু আরসেনিক! বাস্—রাতারাতিই কুপো কাৎ। আমি এক সার্টিফিকেট্ দিয়ে দোবো—যে আসল এসিয়াটিক কলেরা। এক দাস্তেই ফরসা। আমার কথায় অবিশ্বাসও কেউ করতে পারবে না। রাতারাতি মুদ্দোফরাস ডাকিয়ে লাস জ্বালিয়ে দেবো। তখন আর আমায় ধরে কোন্ শালা? তার পরেই টাকার আণ্ডিল হয়ে বসবো। একেবারে লাখ্পতি। উঃ—আমি আর থাকৃতে পারছি নি। প্রভা এখনও ঘুমুচ্ছে। যাই—আমি তাকে ডেকে তুলি গিয়ে। একটা উপায় এখনি ঠিক করি। উঃ—লাখ্পতি! দু হাজার নয়—দশ হাজার নয়—লাখ্ লাখ্! যাই বেলা হয়ে গেল। প্রভাকে ঘুম থেকে তুলি গিয়ে।”

পাগলের মত আবল তাবল বকিতে বকিতে বৃদ্ধ প্রভার শয়নকক্ষে প্রবেশ করিল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

মাতার আকস্মিক মৃত্যুতে নলিনীনাথ নিজেকে নিতান্ত অবলম্বহীন মনে করিতে লাগিলেন। সূর্য্য অস্ত যায়। কিন্তু অস্তের ললাটে উদয়ের রক্তচন্দনের লেপ মাখাইয়া রাখিয়া যায়। মহামায়ার মায়া, বিভিন্ন রূপে ভিন্ন ভিন্ন ছাঁদে প্রকটিত হইয়া পুরুষ হৃদয়কে আচ্ছাদিত করিয়া ফেলে। নলিনীনাথ মাতৃস্নেহ-পীযুষ হইতে বঞ্চিত হইলেন বটে, কিন্তু তাঁহার ক্লিষ্ট ও সন্তপ্ত হৃদয়কে স্নিগ্ধ করিল, প্রভার অকৈতব হৃদয়োৎসারিত প্রণয়ের অফুরন্ত চন্দনরস। শয়নে স্বপনে জাগরণে এখন নলিনীনাথের একমাত্র চিন্তার সামগ্রী—প্রভার সরলতামাখা মুখখানি, তাহার ব্রীড়ানমিত ইন্দীবরনয়নের বিলোল চাহনি।

নলিনীনাথের, কি জানি কেন, এখন আর ঘরে মন টিকিত না। তিনি অধিকাংশ সময়ই সহর হইতে দূরে, প্রান্তরের একদেশে বসিয়া বসিয়া প্রকৃতির শ্যামল শোভা দেখিতেন, বনবিহগের কূজন শুনিতেন আর তাঁহার হৃদয়রাণীর মুখখানি হৃদয়ে ধ্যান করিতেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

মাতার মৃত্যুর পাঁচ ছয় দিন পরে একদিন সান্ধ্যভ্রমণে বাহির হইয়া নলিনীনাথ ভাবিতে ভাবিতে পল্লীপথ ধরিয়া অন্য দিন অপেক্ষা সহর ছাড়িয়া একটু বেশী দূরে গিয়া পড়িলেন। রাত্রিও যে একটু অধিক হইয়া পড়িয়াছিল নলিনীনাথের সে খেয়াল আদবেই ছিল না। পল্লীপথ জনশূন্য। রজনী নিস্তব্ধ, কেবলমাত্র ঝিল্লিমুখরিত। সহসা পথপার্শ্বে তিন চারি জন লোকের চাপা গলায় মৃদু আলাপ শুনিয়া নলিনীনাথ চমকিয়া উঠিলেন।

নলিনীনাথ শুনিলেন, একজন বলিতেছে "কোনও ভয় নেই। আমাদের কেউ সন্দেহ করবে না। আজকাল অনেক ভদ্রলোকের ছেলেরা ডাকাতি করছে। লোকে তাই মনে করবে।'

আর একজন কহিল "কাজে এগিয়ে আবার ভয় কিরে? বুড়ো ডাক্তারের ঢের টাকা। আর বাড়ীতে একটা চাকর ছাড়া অন্য লোক নেই। খুব সুবিধে।"

তৃতীয় দস্যু কহিল "তাই চল্। শালা এক টেরে থাকে। ভারি কৃপণ। ঢের পয়সা। যেখানে থাকে সে পাড়ায়ও লোকজন বেশী নেই।"

দস্যুদিগের পরামর্শ শুনিয়া নলিনীনাথ স্তম্ভিত ও কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িলেন। কেমন করিয়া হউক, এখনই গিয়া ডাক্তার বাবুকে খবরটা দিতে হইবে। তিনি ঊর্দ্ধশ্বাসে ডাক্তার বাবুর বাড়ীর দিকে ছুটিয়া চলিলেন।

ডাক্তার বাবুর বাড়ীর বহির্দ্বার ভিতর হইতে অর্গলা-বদ্ধ। নলিনীনাথ ভীতিবিজড়িত স্বরে চীৎকার করিয়া বলিলেন, "কে আছেন? শীঘ্র দরজা খুলুন।" কোনও উত্তর পাইলেন না। তিনি আরও উচ্চৈঃস্বরে ডাকিলেন "ডাক্তার বাবু! ডাক্তার বাবু!"

উপরের জানালার খড়খড়ী খুলিয়া ডাক্তার বাবু কর্কশ ভাবে বলিলেন "ভাল জ্বালা যে! কে তুমি? কি চাও?"

ডাক্তার বাবুর পশ্চাতে দাঁড়াইয়া প্রভা।

ডাক্তার বাবু জিজ্ঞাসিলেন "বল না হে, কে তুমি?"

নলি। আজ্ঞে! আমি নলিনী।

ডাক্তা। নলিনী! তুমি এত রাত্রে কি জন্য, বাবা? এই আমরা বসে বসে তোমার কথাই ভাবছিলুম। তা, তোমার কোনও চিন্তা নেই। আমিই অভিভাবক হয়ে, তোমার সম্পত্তি রক্ষা করবো।"

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

নলিনী। মহাশয়! ও সব কথা পরে হবে। এখন ভারী বিপদ। শীঘ্র দরজা খুলুন।

বিপদের কথা শুনিয়া প্রভার প্রাণ উড়িয়া গেল। পিতার অনুজ্ঞার অপেক্ষা না করিয়া সে তাড়াতাড়ি আসিয়া দ্বার খুলিয়া দিল।

নলিনীকান্ত হাঁপাইতে হাঁপাইতে কাতরভাবে কহিলেন "ভারী বিপদ। আপনার বাড়ীতে আজ রাত্রে ডাকাত পড়বে। আমি নিজের কাণে তাদের পরামর্শ শুনে এলুম।"

ডাকাতের নাম শুনিয়াই ডাক্তার বাবু ভয়ে অভিভূত হইয়া পড়িলেন ও জড়িত স্বরে কহিলেন "এ্যাঃ—এ্যাঃ—সত্যি নাকি! বাবা নলিনী! তা হ'লে কি হবে?

"হবে আবার কি? সময় থাক্‌তে টাকাকড়িগুলো নিয়ে আমাদের বাড়ীতে চলুন।"

"জিনিস পত্র?"

"জিনিস পত্র সব থাক। কেবল টাকা কড়ি ও গয়না টয়নাগুলো সব সঙ্গে নিন্।"

প্রভা কহিল "বাবা! দেরী কর্‌বেন না। ওঁর কথা শুনুন। শীঘ্র চাবি দিন, চলুন।"

ডাক্তার বাবু অতি কষ্টে প্রভার হাতে চাবি দিলেন। প্রভা আয়রণ-সেফ খুলিয়া টাকা-কড়ি ও গহনাপত্রগুলি গুছাইয়া পুঁটুলি বাঁধিতে লাগিল। ডাক্তার বাবু "হায়! হায়—" করিয়া মাথা চাপড়াইতে লাগিলেন।

এমন সময়ে ডাকাতের দল "রে—রে—" শব্দ করিয়া মশাল জ্বালিয়া, শাবল ও অস্ত্রের সাহায্যে বাড়ীর বাহিরের দরজা ভাঙ্গিয়া ভিতরে প্রবেশ করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল।"

ডাক্তার বাবু ভয়ে নলিনীনাথকে জড়াইয়া ধরিয়া কহিলেন "নলিনী! আমাদের রক্ষা কর।"

প্রভা তাড়াতাড়ি গিয়া একটি আলমারি খুলিয়া যেন কি খুঁজিতে লাগিল। নলিনীনাথ দেখিলেন আলমারির মধ্যে একটি ম্যাগেজিন রিভলভার ও কতকগুলি কার্টিজ রহিয়াছে। নলিনীনাথ দৌড়িয়া গিয়া ক্ষিপ্র-করে সেই রিভলভারটী বাহির করিয়া তাহাতে টোটা ভরিয়া প্রস্তুত করিয়া রাখিলেন। সেই অবসরে ডাকাতের দলও চীৎকার করিতে করিতে সেই স্থানে প্রবেশ করিল। একজন ডাকাত বৃদ্ধ ডাক্তারের পক্কশ্মশ্রু ধরিয়া একটান দিয়া কহিল "দে

শালা! লোহার সিন্দুকের চাবি বের করে দে।" আর এক-জন দৌড়িয়া গিয়া সজোরে প্রভার হাত ধরিয়া হিড় হিড় করিয়া টানিতে টানিতে কহিল "আমি যাদু! টাকার জন্য ডাকাতি কর্‌তে আসিনি। এসেছি তোমার জন্য চাঁদবদনি!" প্রভা তাহার হাত ছিনাইয়া লইয়া দস্যুর বুকে সজোরে এক পদাঘাত করিল। দস্যু তাহাকে পুনরাক্রমণ করিতে গেল।

বৃদ্ধ ভয়ে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। নলিনীনাথ এতক্ষণ ভাবিতেছিলেন, রিভলভার ব্যবহার করিবেন কি না। এখন উপায়ান্তর না দেখিয়া, যে দস্যু প্রভাকে আক্রমণ করিতেছিল, তাহার পাদদেশ লক্ষ্য করিয়া গুলি করিলেন। নলিনীনাথের লক্ষ্য অব্যর্থ। দস্যু আহত হইয়া ক্রোধে শার্দ্দূলের ন্যায় এক লাফে গিয়া নলিনীনাথকে আক্রমণ করিল আর একজন ডাকাত ছোরা হস্তে তাহার সহায়তা করিতে গেল। প্রভাও তখন একরূপ মরিয়া হইয়া গিয়াছে। সে তাড়াতাড়ি দৌড়িয়া গিয়া নলিনীনাথের হাত হইতে পিস্তলটী লইয়া আততায়ীদিগের উপর অজস্র গুলি ছুঁড়িতে লাগিল। স্ত্রীলোকের এইরূপ বীরত্ব ও সাহস দেখিয়া

ডাকাতের দল ভীত হইয়া প্রস্থানের উদ্যোগ করিল। যে ডাকাত নলিনীনাথকে ছোরা লইয়া আক্রমণ করিয়াছিল, নলিনীনাথ তাহার দক্ষিণ হস্তের মণিবন্ধে একটী কঠিন মুষ্ট্যাঘাত করায়, তাহার হাত হইতে ছোরাখানি ঠিকরিয়া পড়িয়া, অচেতন ডাক্তার বাবুর বক্ষস্থল বিদ্ধ করিল। সেই সাংঘাতিক আঘাতেই ডাক্তারবাবুর প্রাণ বিয়োগ হইল। প্রভা দৌড়িয়া গিয়া 'বাবা! বাবা!' বলিয়া চীৎকার করিয়া কাঁদিতে লাগিল। ডাকাতের দল তখন পলাইয়া গিয়াছে। বাণবিদ্ধা কুররীর ন্যায় চীৎকার করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে প্রভা কহিল "বাবা! তুমি চলে গেলে। আমার স্থান এখন কোথায়?" "কেন প্রভা! আমার হৃদয়তলে তোমার তরে সুবর্ণসিংহাসন পাতা রয়েছে।" এই বলিয়া নলিনীনাথ প্রভাকে বুকে টানিয়া লইয়া তাহার গোলাপী গণ্ডে একটি উষ্ণ চুম্বন অঙ্কিত করিলেন।

প্রভা এতক্ষণে দেখিতে পাইল নলিনীনাথেরও উত্তরীয় রক্তসিক্ত। তিনিও আততায়ী দ্বারা আহত।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

লতিকার আশ্রয়ভূত বৃক্ষটি যখন ঝড়ে পড়িয়া যায়, তখন অন্য বৃক্ষ অবলম্বন না করিলে সে বাঁচে কেমন করিয়া? নিরাশ্রিতা প্রভা পরদিন হইতেই নলিনীনাথের গৃহে আশ্রয়লাভ করিলেন। ভবিতব্যতার সূত্র ছিন্ন করে,—সে সাধ্য কাহার? ইচ্ছাময়ের ইচ্ছার গতি প্রতিরুদ্ধ করিবে কে?

অবস্থার সমতা মানবহৃদয়ে সমবেদনার উদ্রেক করে। তাহাতে তাহাদের মধ্যে যদি আবার সমপ্রাণতা বর্ত্তমান থাকে, তবে ত কথাই নাই। একটি হৃদয়কে আর একটির সহিত দৃঢ় পাশে আবদ্ধ করিতে হইলে যতগুলি সরঞ্জামের প্রয়োজন হয়, নলিনীনাথ ও প্রভার সম্পর্কে সে সবগুলিই যেন একসঙ্গে আসিয়া, তাহাদিগকে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধিয়া ফেলিল। এ বাঁধন যে বিধাতার নির্ব্বন্ধ!

দশ দিনে কলিকাতার বাটীতে গিয়া, গঙ্গাতীরে নলিনীনাথ তাঁহার মাতার শ্রাদ্ধাদি কার্য্য সম্পন্ন করিলেন। প্রভাও তাঁহাদের সঙ্গেই রহিল। অভিভাবকবিহীন

স্বাধীনবৃত্তি যুবক যুবতীর একত্রবাস বিনা কারণেও নিন্দুকের রসনার টীকাটিপ্পনির হাত এড়াইতে পারে না। নলিনীনাথ তাহা বেশ বুঝিয়াছিলেন। এবং প্রভার সম্পর্কে তাঁহার কর্ত্তব্য কি, তাহাও পূর্ব্ব হইতেই, তিনি এক প্রকার স্থির করিয়া লইয়াছিলেন। ভগবান দেওয়ান প্রভাকে বধূর ন্যায় আদরের চক্ষে দেখিতে লাগিলেন। এইভাবে দুই তিন মাস গত হইল। বিবাহ ব্যাপারে বরকন্যা উভয়েরই প্রবল ইচ্ছা থাকিলেও, লজ্জা আসিয়া অভীষ্টের পথে অন্তরায় হয়। কেহ আসিয়া সেই লজ্জার বাঁধ ভাঙ্গিয়া দিলে সিদ্ধি সহজলভ্য হইয়া পড়ে। বৃদ্ধ ভগবান দেওয়ান সেই ভার নিজে গ্রহণ করা ভিন্ন উপায়ান্তর নাই দেখিয়া, একদিন নলিনীনাথকে একান্তে পাইয়া, একটু ঢোক গিলিয়া, তাহার বার্দ্ধক্য-ম্লানজ্যোতি নয়নকোণে একটু শঠতাপূর্ণ হাসির রেখা লুকাইয়া রাখিয়া, আস্তে আস্তে প্রভার সহিত নলিনীনাথের বিবাহের প্রস্তাবটি পাড়িল। নলিনী-নাথও তাহাই চাহিতেছিলেন। তিনি মৌনাবলম্বনে সম্মতি জ্ঞাপন করিলেন।

সেই দিনই কুলপুরোহিত ও কুলগুরু মহাশয় পাঁজি

পরিচ্ছেদ

পুঁথি লইয়া নলিনীনাথের কলিকাতার বাটীর দপ্তরখানায় বসিয়া অনেকক্ষণ ধরিয়া ভগবান দেওয়ানের সহিত কথাবার্ত্তা কহিয়া বিবাহের দিন স্থির করিলেন ও চারি হস্তে শূন্য আশীর্ব্বাদের রাশি ছড়াইয়া, তাহার বিনিময়ে দক্ষিণায় পূর্ণ হস্তে, রজনী প্রায় দ্বিপ্রহরের সময় নিজ নিজ বাটীতে ফিরিয়া গেলেন।

তাহার পরে, এক চন্দ্রমালোকিত, মলয়-সেবিত বৈশাখী পূর্ণিমার রাত্রে, গুরুজন ও নমস্যদিগের সধান্যদূর্ব্বা আশীর্ব্বাদের মধ্যে; পুরোহিতের বেদমন্ত্রাহূত হব্যলোলুপ হোমাগ্নিতে পবিত্র লাজক্ষেপের সঙ্গে, নবদম্পতি শিরে অজস্র কুসুমরাশি বর্ষণের মধ্যে; বয়স্য সতীর্থ ও সখাগণের হৃদয়োৎসারিত হাস্য পরিহাস ও কলরবের মধ্যে; দিগন্ত পূর্ণ করিয়া আনন্দের লহর ছুটাইয়া সপ্তমে গীত সানাইয়ে সাহানার মুগ্ধ তানের মধ্যে; চর্ব্ব্য চোষ্য লেহ্য পেয় নানা প্রকার সুখাদ্য সুপেয়ে পরিতৃপ্ত ও পূর্ণোদর 'ইতরেজনার' আনন্দোচ্ছাসের মধ্যে; হরিণীনয়না পুরাঙ্গনাগণের মাঙ্গলিক উলুধ্বনির মধ্যে; সুখস্বপ্নবিভোর বর নলিনীনাথ ও এই আকস্মিক অবস্থা বিপর্য্যয়ের ফলাফল

সম্বন্ধে সন্দিহানা, অথচ নলিনীনাথের রূপে ও গুণে নিতান্ত মুগ্ধা বেপথুমতী প্রভার ভাগ্যসূত্র এক সঙ্গে গ্রথিত হইয়া গেল।

বিবাহ এক প্রকার নিষ্কণ্টকে কাটিয়া গেল। বিবাহের তৃতীয় রজনীতে ফুলশয্যা। ফুলশয্যার রজনীতে প্রভার সহিত প্রথম মিলনের ব্যাকুলতায় যেমন নলিনীনাথ শয্যাগৃহে প্রবেশ করিলেন অমনি, কি জানি কেন, তাঁহার কণ্ঠ হইতে সন্ন্যাসীদত্ত সেই মণিমালাটি খসিয়া পড়িল। প্রভা তাড়াতাড়ি আসিয়া উহা কুড়াইয়া লইয়া স্বামীর গলায় পরাইয়া দিল। নলিনীনাথ কি যেন একটা ভাবী দুর্নিমিত্তের ভয়ে ব্যাকুল হইয়া কহিলেন "প্রভা! আমার বোধ হয়, আমাদের কোনও একটা ভয়ঙ্কর অমঙ্গল হবে। তা না হ'লে, কেন হঠাৎ আমার হারটি বিনা কারণে খসে পড়লো?"

প্রভা স্বামীকে ব্যাকুল দেখিয়া চিন্তিত হইল।

নলিনীনাথ কহিলেন "এই ভাবী দুর্নিমিত্তের একটি প্রতিক্রিয়া করা প্রয়োজন। আমি কালই হরিদ্বার রওনা হবো, এবং সেই সন্ন্যাসীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করবো।"

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

প্রভা স্বামীকে কত বুঝাইল। এত তাড়াতাড়ি হরিদ্বার যাইতে তাঁহাকে কত মানা করিল। নলিনীনাথ কোন কথাই মানিলেন না। তাঁহার মন উদ্বিগ্ন হইয়াছে। ভগবান দেওয়ানকে তখনই সেই খানে ডাকান হইল। তাঁহার সহিত পরামর্শে স্থির হইল, পরদিন রাত্রেই পঞ্জাব-মেলে নলিনীনাথ হরিদ্বার যাইবেন। দুই দিনের জন্য যাওয়া। সেই জন্য নলিনীনাথ সঙ্গে লোক জন চাকর-বাকর লইবেন না।

সেই ব্যবস্থানুরূপ কার্য্যও হইল।

নলিনীনাথ চলিয়া গেলে পর, প্রভা বালিসে মুখ লুকাইয়া কত কাঁদিল। কাঁদিতে কাঁদিতে বালিস ভিজিয়া গেল। তবু সে কান্না থামে না। প্রভার নয়ন-কোণে যে সপ্তসাগরের সমস্ত বারি লুকাইয়াছিল, ইহার আগে সে নিজেও তাহা জানিত না।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

ডাক্তার বাবুর চাকর হলধর আর এখন সে 'হলা' নাই। এখন সে একটা 'কেষ্ট বিষ্ণুর' মধ্যে পরিগণিত হইয়া প্রভার বাটীতে আসিয়া অধিষ্ঠিত হইয়াছে। অবস্থার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে হলধরের বেশভূষারও পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। এখন তাহার গায়ে ফিন্‌ফিনে জালিদার রং করা গেঞ্জী। পরিধানে চওড়া লাল কস্তা পেড়ে শাড়ী। পায়ে চটী জুতা। স্কন্ধে মুরগী-আঁকা তোয়ালে। বহু দিন ডাক্তারের বাড়ীতে চাকরী করায় চাকর-বাকর মহলে ধারণা, যে হলধর তাহার পুরাতন মনিবের দুই চারিটী প্রেস্‌ক্রুপ্‌সন ও তাহার সঙ্গে সঙ্গে, তাঁহার চিকিৎসাশাস্ত্রে জ্ঞানও কিঞ্চিৎ মারিয়া লইয়াছিল। হলধরের নলিনীনাথের বাটীতে অধিষ্ঠানের পর হইতে চাকর মহলে মাঝে মাঝে এক আধটুকু চিকিৎসা-বিভ্রাট ও ক্ষুদ্র আপদ বিপদ ঘটিত। প্রথমে কেহই তাহার কারণ নির্দ্ধারণ করিতে পারে নাই। ক্রমে

জানা গেল, যে হলধরের ডাক্তারীই সেই সকল ক্ষুদ্র বিভ্রাটের মূল কারণ।

একদিন লবধন নামে একটি চাকর তাড়াতাড়ি আসিয়া হলধরকে কহিল "হলা দাদা! তুমি এখানে নিশ্চিন্দি বসে রয়েছ। আর এ দিকে আমি যে মরি। আমার পেট গেল দাদা! পেট গেল।"

হল। কেন রে, তোর কি হয়েছে?

লব। আমার পেট ভয়ানক সেঁটে ধরেছে।

"তার জন্য ভয় কি? এই দেখ্—এখ্খুনি সারিয়ে দিচ্ছি।" এই কথা বলিয়া হলধর ব্যস্ত ভাবে বাহির হইয়া গিয়া, পাশের ঘর হইতে একটি প্রকাণ্ড গড়্গড়ার নল আনিয়া, তাহার এক দিক লবধনের মুখের মধ্যে প্রবিষ্ট করাইয়া দিল, অপর দিক তাহার নিজের কানে দিয়া কহিল "কাশ্ দেখি একবার, একটু জোরে।" লবধন কাশিতে লাগিল।

হল। থাক্! থাক্! আর কাশ্তে হবে না। তোর পেটে কুপিত মল আছে দেখ্ছি। এক কাজ কর্। রেড়ীর তেল এক বাটি খা। তাতে ভরি খানেক আফিং

গুলে নিস্। যদি রেড়ীর তেলে বেশী নাবায়, তা হলে আফিংয়ে সেটাকে টেনে রাখ্‌বে। বুঝলি কি না? যা—দেরি করিস্‌নি।

লব। হলু দা! আফিংয়ে তেলে খাব? শেষে কিছু হবে না ত?

হল। হবে আবার কি? আমি কি বই-টই না দেখেই তোকে যা তা একটা ওষুধ দিচ্ছি।

লবধন 'আচ্ছা' বলিয়া ঔষধের চেষ্টায় গেল। আফিং মিলিল না বলিয়া, কেবল খানিকটা রেড়ীর তেল আনিয়া সে খাইয়া ফেলিল। ইহাতে দারুণ অনিষ্ট অবশ্য একটা কিছু ঘটিল না। তবে তৈলের মাত্রা অধিক হওয়ায় রেচন কিছু বেশী হইল। কথাটা চাকরদিগের মধ্যে কানাঘুষা হইতে হইতে, ক্রমে ভগবান দেওয়ানের কানে পৌছিল।

দেওয়ানজী লবধনকে একাকী ডাকিয়া, ব্যাপার কি, জিজ্ঞাসা করিলেন। লবধন, হলধরের চিকিৎসা-চাতুর্য্য ব্যাপারটি আমূল খুলিয়া বলিল।

দেওয়ানজী চমকিয়া উঠিয়া কহিলেন "সর্ব্বনাশ! ওরে বেটা! তেল আফিং দুই-ই খেয়েছিস্ নাকি?"

লব। আজ্ঞে, খালি তেল খেয়েছি। আফিং পেলাম না।

দেও। যা বেটা! বেঁচে গিইছিস্। খবরদার আফিং খাস্নি।

ইহার কিছুক্ষণ পরে, দেওয়ানজী হলধরকে একান্তে ডাকিয়া কহিলেন "বাবা হলধর! আর যা হয় ক'র। এই চিকিচ্ছেটা ছেড়ে দাও। কবে পুলিপোলাও যাবে?"

"আজ্ঞে, দেওয়ানজী! আপনি সে ভাবনা করবেন না। আমি ডাক্তার বাবুর কাছ থেকে এ বিদ্যেটা অনেক শিখে নিইছি।

"তা ত দেখতেই পাচ্ছি। তবে কি না, নতূন বিয়ের কনেগুলো একটু ডাক্তারির ওপর চটা। তুমি বিয়ে করবার জন্য ব্যস্ত হয়েছ। তা ডাক্তারিটা না ছাড়লে তো আমরা তোমার জন্য উপযুক্ত পাত্রী জোগাড় করতে পারছি না।"

বলা বাহুল্য যে, বিয়ে-পাগলামিটা হলধরের বিকৃত মস্তিষ্কের একটা প্রধান খেয়াল ছিল। দেওয়ানজী এ কথা জানিতেন। এবং এই মানসিক দুর্ব্বলতার অলক্ষিত

রন্ধ্রপথে প্রবেশ করিয়া হলধরকে সম্পূর্ণ রূপে করায়ত্ত করিয়া লইতে কুট বুদ্ধি বৃদ্ধ জমীদারের দেওয়ান ভগবানের বড় অধিক সময়ক্ষেপ করিতে বা বেগ পাইতে হইল না।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

হরিদ্বারে পৌঁছিয়া নলিনীনাথ সেই দিনই সত্য-নারায়ণজীর মন্দিরাভিমুখে যাত্রা করিলেন। এই মন্দিরটি হরিদ্বার হইতে প্রায় চারি ক্রোশ উত্তরে। সেখানে পৌঁছিতে নলিনীনাথের বেলা দ্বিপ্রহর অতীত হইল। সেখানে সন্ন্যাসীর সন্ধান লইতে লইতে জানিতে পারিলেন, যে মহাপুরুষ প্রায় এক সপ্তাহ পূর্ব্বে পশুপতিনাথ দর্শন করিবার জন্য নেপালে গিয়াছেন। কবে ফিরিবেন তাহার কিছুই স্থিরতা নাই। নলিনীনাথ একদিন সেখানে থাকিয়া, তাহার পরদিন অনন্যোপায় হইয়া হতাশ ভাবে হরিদ্বার অভিমুখে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন ও সেই দিনই গঙ্গা পার হইয়া চণ্ডীদেবীর পর্ব্বত বামে রাখিয়া সোজা পথ ধরিয়া চলিতে লাগিলেন। তাঁহার গন্তব্যস্থানের তখন কোনও স্থিরতা ছিল না। আকাশে সন্ধ্যা ঘনাইয়া আসিল। নলিনীনাথ দেখিলেন যে, আনমনে চলিতে চলিতে তিনি একটি নিবিড় পার্ব্বত্য

অরণ্যের প্রান্তে আসিয়া পড়িয়াছেন। যে পথ ধরিয়া তিনি আসিতেছিলেন সেই পথ-রেখা ক্রমে ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইয়া এই খানেই আসিয়া শেষ হইয়া গিয়াছে। সেখানে লোকালয়ের লেশ মাত্র নাই। কেবল দূরে পর্ব্বত-গাত্রে এক আধটী জীর্ণ-পর্ণশালার রন্ধ্র পথে ক্ষীণ দীপালোক দেখা যাইতেছিল। নলিনীনাথ কি করিবেন, কোথায় যাইবেন, কিছুই স্থির করিতে পারিতেছিলেন না। এই সময়ে একদল পার্ব্বত্য বালিকা সেই পথে গৃহে ফিরিতেছিল। ইহাদের দেহের কানায় কানায় রূপ। নয়ন-কোণে উচ্ছলিত উদার প্রীতি ও সরলতা। এই দুর্গম বন স্থলে অপরিচিত আগন্তুককে দেখিয়া বালিকাগণ একটু বিস্মিত হইল। তাহারা একদৃষ্টে তাহাকে দেখিতে লাগিল। নলিনীনাথ পার্ব্বতীয় ভাষা জানিতেন না। মিশ্রিত হিন্দুস্থানীতে জানাইলেন যে তিনি বিদেশী, বিপন্ন, পথভ্রান্ত, শ্রান্ত ও ক্ষুধার্ত্ত। বালিকাগণ তাঁহার কথা শুনিয়া ব্যথিত হইল ও তাঁহাকে দূরে একটি ক্ষুদ্র পার্ব্বত্য গ্রাম দেখাইয়া কহিল "ওইটি আমাদের পল্লী। চলুন ওইখানে

আপনাকে লইয়া যাই।" এই বালিকা দলের নেত্রী ছিল একজন যুবতী। যুবতী স্বর্ণ লতিকার ন্যায় তন্বী। চম্পক-কলিকার মত গৌরী। ফুল্লযুথিকার ন্যায় হাস্যময়ী। গিরি নির্ঝরিণীর ন্যায় প্রাণময়ী। সে বালিকাদলকে পার্ব্বত্য ভাষায় কি আদেশ দিল। বোধ হয়, পথিকের জন্য কিছু খাদ্য সংগ্রহ করিয়া আনিতে বলিল। তাহার কথায় বালিকাগণ হাসিতে হাসিতে গান গাহিতে গাহিতে প্রস্থান করিল। সে তখন নলিনীনাথের সমীপে আসিয়া ভগ্ন হিন্দুস্থানীতে কহিল "আপনি আমার সঙ্গে আসুন। আপনি দেখিতেছি অত্যন্ত ক্লান্ত। পল্লী এখান হইতে অনেক দূর। আপনি তত দূর চলিয়া যাইতে পারিবেন না। এখানে একটি ক্ষুদ্র পর্ব্বতের গহ্বর আমার জানা আছে। সেইখানে কোনও প্রকারে রাত্রিটা কাটাইয়া কাল প্রাতেই আমি আপনাকে পল্লীতে লইয়া যাইব।"

নলিনীনাথ বাস্তবিকই অত্যন্ত পরিশ্রান্ত হইয়াছিলেন। আর পথ চলিতে পারিতেছিলেন না। তিনি যুবতীর পরামর্শ গ্রহণ করা ভিন্ন উপায়ান্তর দেখিতে পাইলেন না।

যুবতী আগে আগে পথ দেখাইয়া চলিল। অন্ধকারে সঙ্কীর্ণ কঙ্করময় বন্ধুর পার্ব্বত্য পথে চলিতে নলিনীনাথের বিষম কষ্ট হইতে লাগিল। দুই একবার পদস্খলিত হইয়া তিনি পড়িয়াও গেলেন। তাহা দেখিয়া, প্রকৃতির দুহিতা বিমল-স্নেহপূর্ণ-হৃদয়া কলঙ্কলেশশূন্যা এই পার্ব্বত্যরমণী পার্ব্বত্যসরলতায় ছুটিয়া আসিয়া নলিনীনাথের হাত ধরিল।

সেই স্পর্শে নলিনীনাথ প্রমোহিত হইলেন। তাঁহার অক্ষিদ্বয় রসাবেশে নিমীলিতপ্রায় হইয়া আসিল। তাঁহার মস্তক ঘুরিতে লাগিল। তাঁহার কলেবর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল।

নলিনীনাথ জিজ্ঞাসিলেন "শুভে! তোমার নাম কি?"

যুবতী উত্তর দিল "আমার নাম মহামায়া।"

নলিনীনাথ পাশ্চাত্য দর্শনে সুপণ্ডিত ছিলেন। প্রাচ্য দর্শনেও তাঁহার বিশেষ অনুরাগ ছিল। শঙ্করাচার্য্য, গৌতম, কণাদ প্রভৃতি মনীষী ঋষিগণ যে 'মায়ার' স্বরূপ তত্ত্ব জানিবার জন্য যুগ যুগ ধরিয়া তপস্যায় কাটাইয়াছেন, যাহার সন্ধানে, তাঁহারা হিমালয় হইতে কুমারিকা পর্য্যন্ত, আচট্টল

গান্ধার অবধি তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিয়া বেড়াইয়াছেন। আজ, কি তপস্যার বলে, কোন্ পুণ্যফলে, নলিনীনাথ বুঝিতে পারিতেছিলেন না, সেই জ্ঞানযোগিজন চিরবাঞ্ছিত 'মায়া', আজ এরূপ অপ্রত্যাশিত ভাবে এই স্বভাব-সুন্দরী পার্ব্বত্য রমণীর রূপ ধরিয়া আসিয়া 'মহামায়া' নামে তাঁহার সকাশে পূর্ণ মহিমায় প্রকাশিত হইলেন!

নবম পরিচ্ছেদ।

কিছুদূর গিয়া, নলিনীনাথ পর্ব্বতগাত্রে একটি ক্ষুদ্র গহ্বর দেখিতে পাইলেন। তাহার মুখটি একখানি শিলাফলকে নির্ম্মিত কবাটের মত জিনিসের দ্বারা আবদ্ধ। সেই শিলাফলকখানিকে একটু কৌশলে ঠেলিয়া দিতেই গহ্বরের মুখ দেখা গেল। মহামায়া নলিনীনাথের হাত ধরিয়া তাহাকে অতি সন্তর্পণপাদবিক্ষেপে সেই গহ্বর মধ্যে লইয়া গেল। গুহাটী অন্ধকারময়। মহামায়া অচিরে তাহার পৃষ্ঠবিলম্বিত একটি থলি হইতে একখণ্ড লৌহ, একখানি চকমকি প্রস্তর ও এক টুকরা সোলা বাহির করিল। লৌহ ও প্রস্তরে পরস্পর আঘাত করিয়া প্রস্তর হইতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বাহির হইলে, সে তাহারই সাহায্যে সেই সোলার টুকরাতে অগ্নি জ্বালাইল। তাহার পর সে দৌড়িয়া গিয়া বাহির হইতে কিছু শুষ্ক পত্র ও লতাগুল্মাদি সংগ্রহ করিয়া আনিয়া একটি অগ্নিকুণ্ড প্রজ্বালিত করিল। সেই আলোকে নলিনীনাথ দেখিতে পাইলেন যে, গহ্বরটি বেশ বড়। তাহার মধ্যস্থলে

একখণ্ড সমতল শিলা। তাহার উপর একজন মানুষ অক্লেশে শয়ন করিতে পারে। অগ্নির উত্তাপে গহ্বরটি বেশ গরম হইয়া উঠিয়াছিল। মহামায়া নলিনীনাথকে সেই শিলাতলে শয়ন করিতে ঈঙ্গিত করিল। নলিনীনাথও বিশ্রামেরই জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। তিনি বিনা-বাক্যব্যয়ে গিয়া শিলাতলে শয়ন করিলেন। মহামায়া তাঁহার নিকটে উপবেশন করিয়া ধীরে ধীরে নলিনীনাথের মস্তকটি আপন উৎসঙ্গে উঠাইয়া লইয়া একদৃষ্টে তাঁহার চিন্তা ও অবসাদক্লিষ্ট মুখের পানে চাহিয়া রহিল। নলিনীও মন্ত্র-মুগ্ধের ন্যায় যুবতীর মুখের পানে অনিমেষ-নয়নে চাহিয়া রহিলেন।

পাঠক মানব-হৃদয়-নিহিত চৌম্বক শক্তির সত্তায় আস্থাবান কিনা জানি না, কিন্তু তাঁহার জীবনে যে তিনি, বহুবার না হউক, অন্ততঃ এক আধবারও এই বিরাট শক্তির বিকাশ, ইহার প্রবল আকর্ষণ বিকর্ষণ, ইহার আশীবিষ-দংশনের ন্যায় তীব্র জ্বালা, ইহার চন্দন-রসের ন্যায় স্নিগ্ধতা অনুভব করেন নাই, তাহা আমি কল্পনা করিতে পারি না। জড়-বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতগণ

জড়জগতের অন্তর ও বহির্নিহিত বহু বহু প্রবল শক্তির অস্তিত্ব সপ্রমাণিত করিয়াছেন ও করিতেছেন, কিন্তু তাঁহাদের দ্বারা প্রমাণিত ও কল্পিত বৈদ্যুতিক শক্তিই বল আর রেডিও-বৈদ্যুতিক শক্তিই বল, উৎকটতায় জ্বালায় স্নিগ্ধতায়, সে সমস্ত শক্তিই যে মানবের মনোজগতের অন্তর্নিহিত এই প্রবল চৌম্বকশক্তির নিকট পরাস্ত হয়, ইহা ভুক্তভোগী ভিন্ন অন্যের উপলব্ধি করা অসম্ভব। এই শক্তির ক্রিয়া অতীব জটিল, রহস্যময়, সাধারণ যুক্তি-মার্গবিগর্হিত, নিয়মবিরহিত ও সৃষ্টিছাড়া। সমধর্ম্মাক্রান্ত দুইটী হৃদয়, এই শক্তির পরিধি মধ্যে উপস্থিত হইলে, একের স্নায়বীয় সূত্র ও মস্তিষ্কের কেন্দ্র পথে ইহা অপরের হৃদয়ে সংক্রামিত হয়। তখন এই দুইটি হৃদয়ের মধ্যে জড়জগতে পরিদৃশ্যমান পার্থক্য ঘুচিয়া গিয়া তাহারা একীভূত হইয়া যায়। তাহাদের বিশ্লেষণ একপ্রকার অসম্ভব হইয়া উঠে। এই শক্তির আর একটি প্রধান ধর্ম্ম এই যে, ইহা মানুষকে অহমিকা বিসর্জ্জিত করিতে শিক্ষা দেয়, তাহাকে পরের জন্য প্রাণ দিতে প্রলুব্ধ করে, তাহাকে মোক্ষের অক্ষয় পথে অগ্রসর করিয়া দেয়। স্থানকালপাত্রভেদে ইহার

নাম ক্রিয়া ও অভিব্যক্তি বিভিন্ন। বালকে বালকে এই আকর্ষণের নাম—সৌহৃদ্য। যুবক যুবতীতে এই আকর্ষণের নাম—অনুরাগ। গুরু শিষ্যে এই আকর্ষণের নাম—ভক্তি; পিতামাতায় ও সন্তান সন্ততির মধ্যে এই আকর্ষণের নাম—বাৎসল্য। নলিনীনাথ ও এই সরলা পার্ব্বত্য বালিকা যে প্রথম সাক্ষাতের মুহূর্ত্তেই তাহাদের নিজ নিজ সত্বা হারাইয়া একীভূত হইয়া গিয়াছিল, তাহার কারণ এই মানবীয় চৌম্বক-শক্তি। আর কিছুই নহে।

সেই রাত্রে নলিনীনাথও ঘুমাইলেন না। মহামায়াও ঘুমাইল না। উভয়ে উভয়ের মুখপানে চাহিয়া চাহিয়া সুদীর্ঘ ত্রিযামা জাগ্রত স্বপ্নে কাটিয়া গেল।

দশম পরিচ্ছেদ।

এ দিকে মহামায়ার পিতামাতা ও আত্মীয়গণ মহামায়ার সঙ্গিনীগণের নিকট সেই অপরিচিত যুবকের কথা শুনিয়া, তখনই কন্যার অন্বেষণে বাহির হইল। তাহারা মশাল জ্বালাইয়া বনের প্রত্যেক অংশ, প্রত্যেক ঝরণার খাদ, প্রত্যেক পর্ব্বতগুহা তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিল। নিয়তির লীলা বিচিত্র। যে গুহায় নলিনীনাথ ও মহামায়া আশ্রয় লইয়াছিলেন, সে দিকে ভুলিয়াও কেহই আসিল না। নিষ্ফল অন্বেষণে ক্রমে রাত্রি অধিক হইল। তাহারা হতাশভাবে গৃহে ফিরিয়া গেল। পরদিন অতি প্রত্যূষে উঠিয়াই তাহারা আবার মহামায়ার খোঁজে বাহির হইল। তখন নলিনীনাথ ও মহামায়া গুহা পরিত্যাগ করিয়া বাহির হইয়াছেন ও পল্লী অভিমুখে যাত্রার উদ্যোগ করিতেছেন।

মহামায়াকে দেখিয়াই তাহার মাতা দৌড়িয়া গিয়া তাহাকে আলিঙ্গনাবদ্ধ করিল। তাহার পিতাও তাহার নিকটে গিয়া কহিল কেন বল্ তো "মা! কাল রাত্রে

আমাদিগকে এত ভোগাইয়াছিলি! তুই কোথায় ছিলি?"

মহা। কেন ওই গুহার মধ্যে। আমার বরের সঙ্গে।

পিতা। কে তোর বর?

মহা। ওই বাবুজি।

পিতা। ছি মা! ও কথা কি বলতে আছে? উনি বিদেশী লোক। আমাদের জাত নন। ওঁর সঙ্গে কি বিয়ে হয়।

মহা। আমি ওঁকে বিয়ে করেছি। উনিও আমায় বিয়ে করেছেন। উনিই আমার বর। এই দেখ, উনি কাল রাত্রে আগুন সাক্ষী করে আমার গলায় এই মালা পরিয়ে দিয়েছেন। কেমন সুন্দর মোতির মালা। এমন সুন্দর মালা কারও নেই। এমন সুন্দর বরও কারও নেই।

এই কথা বলিয়া মহামায়া তাহার মরাল-বিনিন্দিত নিটোল, সুডৌল, সুশোভন কণ্ঠে বিলম্বিত সুন্দর মুক্তাহার সকলকে দেখাইল। প্রেমে কিরূপ বিস্মৃতি ঘটে, পাঠক তাহা বুঝিয়াছেন কি? এই হার নলিনীনাথের মাতৃদত্ত সেই মণিমালা—যাহা তিলেকের জন্য কণ্ঠচ্যুত করাও

তাঁহার মাতার মরণ-কালীন নিষেধাজ্ঞা। মাতৃভক্ত নলিনীনাথ তাহাও ভুলিয়াছিলেন। এই জন্যই বলে 'নিয়তিঃ কেন বাধ্যতে'।

মহামায়ার মাতা কন্যাকে বুঝাইয়া কহিলেন "ছি মা! ও রকম্ অন্যায় আব্দার কি করতে আছে? শান্তমায়া ঠিক এমনই-তর একজন অপরিচিত যুবকের প্রণয়ে মুগ্ধ হ'য়ে তাকে বিয়ে করলে। তার বরও তাকে প্রথম প্রথম কত আদর যত্ন করলে। শেষে তাকে ছেড়ে দিয়ে নিজের দেশে পালিয়ে গেল। মা! অপরিচিত বিদেশীকে কি বিশ্বাস করতে হয়? তোর দিদি খুব চালাক আর দেখতেও খুব সুশ্রী ছিল, তাই দিল্লীতে গিয়ে বাইজীর গান শিখে ও সেই ব্যবসা করে এখন বেশ অবস্থা ভাল করেছে। মনে কর তো মা! যদি সে তা না করতো, তবে তার কি দশা হতো?"

মহামায়ার পিতামাতা তাহাকে কত বুঝাইল। সে কিছুতেই তাহাদের নিষেধ মানিল না। স্পষ্ট কহিল যে, এ বিবাহে যদি তাহার পিতামাতা আপত্তি করে তবে সে আত্মহত্যা করিবে।

কন্যার নির্ব্বন্ধাতিশয্যে অগত্যা মহামায়ার পিতামাতাকে সম্মত হইতে হইল।

সেই দিনই গোধূলিলগ্নে মৌন মুগ্ধ পার্ব্বত্য প্রকৃতির সাক্ষাতে পার্ব্বত্য রীত্যনুসারে নলিনীনাথ ও মহামায়ার বিবাহ হইয়া গেল।

নলিনীনাথ যেমন তাঁহার নিজকণ্ঠের বনযূথিকা রচিত মালা মহামায়ার কণ্ঠে পরাইয়া দিবেন, অমনি প্রকৃতির বিরাট আস্যে একটি বিকট হাস্য-রেখা দেখা দিল। গগন-তল উদ্ভাসিত করিয়া একটি তীব্রোজ্জ্বল বিদ্যুল্লেখা স্ফুরিত হইল। তাহা দেখিয়া নলিনীনাথ চমকিয়া উঠিলেন।

পাঠক নিশ্চয়ই নলিনীনাথকে হৃদয়হীন বহুপত্নীক বলিয়া ঘৃণার চক্ষে দেখিতেছেন। আমি কিন্তু দৃঢ়তার সহিত বলিতে পারি, যে ইহাতে নলিনীনাথের দোষ কিছুই নাই। মানুষ নিয়তির হস্তে ক্রীড়া-পুত্তলিকা মাত্র। বিশ্ব নিয়ন্তা বিরাট পুরুষোত্তম শিল্পীর হস্তে ক্রীড়া পুত্তলিকার হস্ত পদাদি সংলগ্ন সমস্ত রজ্জুগুলি ধৃত রহিয়াছে। তিনি যেমন ভাবে নাচাইবেন, ইচ্ছায় হউক, অনিচ্ছায় হউক, সেইরূপ ভাবেই মানুষকে নাচিতে হইবে।

সম্পূর্ণরূপে আত্ম-বিস্মৃত হইয়া নলিনীনাথ যেন নিমেষে মুছিয়া ফেলিয়া দিলেন, তাঁহার সমস্ত অতীত জীবনের স্মৃতিখানিকে, তাঁহার ভবিষ্যতের আশাটুকুকে। তাঁহাকে জীবিত রাখিল—কেবল বর্ত্তমান!—কেবল মহামায়া!

একাদশ পরিচ্ছেদ।

দিনের পর দিন চলিয়া গেল। সপ্তাহও কাটিতে বসিল। কই নলিনীনাথ তো গৃহে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন না। তাঁহার কোন পত্রাদিও পাওয়া গেল না। প্রভা দারুণ উদ্বেগে ও দুশ্চিন্তায় পাগলিনীর ন্যায় হইয়া উঠিলেন। হরিদ্বারে চেনা-শুনা পাণ্ডাদিগের নিকট কত টেলিগ্রাম পাঠান হইল। নলিনীনাথের কোন সংবাদই তাহারা দিতে পারিল না। প্রভা ভাবিলেন নিশ্চয়ই কোনও নিদারুণ দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে। তিনি আর কাহারও কোন কথা শুনিলেন না। কোন প্রবোধ মানিলেন না। ভগবান দেওয়ানকে ডাকাইয়া কহিলেন "আজ রাত্রেই পঞ্জাব-মেলে আমি হরিদ্বার রওনা হইব। দুই তিনজন দাস দাসী ও একজন পাচক সঙ্গে লউন। উপযুক্ত পাথেয়ও ঠিক করিয়া রাখুন।"

ভগবান দেওয়ানও বিশেষ চিন্তিত হইয়াছিলেন। প্রভার এই প্রস্তাব তিনি সাগ্রহে অনুমোদন করিলেন।

প্রভা সেই দিন রাত্রেই ভগবান দেওয়ানকে সঙ্গে লইয়া

হরিদ্বার অভিমুখে যাত্রা করিল। পথে বিষম উৎকণ্ঠায় প্রভার দুই দিন কাটিল। হরিদ্বারে পৌঁছিয়াই প্রভা তন্ন তন্ন করিয়া নলিনীনাথের খোঁজ করিতে লাগিল। কেহ কেহ বলিল যে, একজন বাঙ্গালী বাবু সপ্তাহ পূর্ব্বে এখানে আসিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তিনি একদিন মাত্র থাকিয়া কোথায় যে চলিয়া গিয়াছেন তাহা কেহই জানে না। প্রভা নলিনীনাথের সন্ধানে চারিধারে লোকজন পাঠাইল, অকাতরে অর্থব্যয় করিতে লাগিল। সকলেই হতাশ হইয়া ম্লান মুখে ফিরিয়া আসিল। কেহ কোনও সংবাদ আনিতে পারিল না। প্রভা মনে মনে স্থির করিল যে, যতদিন না নলিনীনাথের কোনও সন্ধান পান, ততদিন হরিদ্বারের পথে যত নগর গ্রাম আছে, সে সমস্ত তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিবে। তাহার আরাধ্য স্বামি-দেবতার অনুসন্ধানে, প্রয়োজন হইলে, তাহার সমস্ত জীবনটাকেই কাটাইবে। ভগবান দেওয়ান একপ্রকার হতবুদ্ধি হইয়া গিয়াছিল। সেও সমস্ত বিষয়ে প্রভার অনুবর্ত্তী হইয়া তাহার প্রভুর কার্য্যে অবশিষ্ট জীবন উৎসর্গ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইল।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ ।

এদিকে মহামায়ার পিতার সেই জীর্ণ পর্ণ-কুটীরে ছিন্ন দড়ির খাটে শুইয়া, মৃগয়ালব্ধ মাংস বনজাত ফল মূল সবজী ও মোটা চাউলের অন্ন আহার করিয়া এবং মহামায়ার আদর সোহাগ ও যত্নে নলিনীনাথের দিন-গুলি বেশ কাটিতে লাগিল। মানুষের অদৃষ্ট বেজায় খামখেয়ালী। সুখেঁ হউক, দুঃখে হউক, একইভাবে মানুষের সময় কাটিতেছে—ইহা যেন তাহার চক্ষুশূল। ভাল হউক, মন্দ হউক, একটু বিচিত্রতা তাহার চাই-ই চাই।

একদিন সন্ধ্যার প্রাক্কালে আকাশে সূর্য্য যখন ডুবু ডুবু। তখন বনজাত-কুসুম-গন্ধ-সুরভিত একটি লতা বিতানের পার্শ্বে শিলাতলে একান্তে উপবিষ্ট হইয়া নলিনী-নাথ মহামায়ার সহিত বিশ্রম্ভালাপ করিতেছিলেন। সহসা সেই বনপথে দূরে একটি অনুচর-পরিবেষ্টিতা সালঙ্কারা সুবেশা সুন্দরীকে দেখিয়া নলিনীনাথ চমকিয়া উঠিলেন। মহামায়াও তাহাকে দেখিবামাত্র আহ্লাদে করতালি-ধ্বনি করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল "ওই

আমার দিদি—শান্তমায়া! ও-ই! ও-ই দিল্লিতে বিখ্যাত মমতাজ বাইজী নামে পরিচিত। এতদিন পরে বোধ হয় ওর আমাদের কথা মনে পড়েছে। তাই আমাদের দেখ্‌তে এসেছে।”

মহামায়ার কথা শেষ হইতে না হইতেই শান্তমায়া ওরফে মমতাজ বাইজী সেইখানে আসিয়া, নলিনীনাথকে দেখিয়া একটু থমকিয়া দাঁড়াইল। পরে ভগিনীকে সস্নেহে আলিঙ্গন করিয়া মৃদু-স্বরে জিজ্ঞাসিল “ওই লোকটি কেরে, মহামায়া?”

“কেন? আমার বর।”

“তোর বর! তোর আবার বিয়ে হল কবে?”

“কেন?—দশ বারো দিন হলো।”

মমতাজ, কি জানি কেন, তাহার হৃদয়ের অন্তস্তলে একটা দারুণ বিষের জ্বালা অনুভব করিল। তাহার মনে হইতে লাগিল “অদৃষ্টের এ কি ক্রূর পরিহাস! মহামায়া এই দুর্গম বনভূমির ক্রোড়ে লালিতা। তাহার ভাগ্যে এমন বর! জীর্ণ পর্ণশালায় শয়ন করিয়া, আম-মাংসে ও কদর্য্য তণ্ডুলান্নে অর্দ্ধাশনে থাকিয়াও, ইহার হৃদয়ে

এত আনন্দ! আর আমি?—আমি হতভাগিনী মর্ম্মরময় প্রাসাদে, দ্বিরদ-রদ-নির্ম্মিত মূল্যবান পর্য্যঙ্কে দুগ্ধ-ফেন-নিভ শয্যায় শয়ান থাকিয়াও, আমার হৃদয়ের মর্ম্মস্থলে শত বৃশ্চিকের দংশনজ্বালা অনুভব করি। বিলাসী যখন তাহার লালসাদীপ্ত আসব-লিপ্ত ওষ্ঠে, আমার ওষ্ঠপুটে চুম্বন অঙ্কিত করে, তখন আমি আমার সর্ব্বাঙ্গে তীব্র বিষব্রণের জ্বালা অনুভব করি। যখন তাহার ভুজঙ্গপিচ্ছিল বাহুদ্বয় আমাকে আলিঙ্গনাবদ্ধ করে, তখন আমার মনে হয়, যে এই বারবনিতার ব্যবসায় অবলম্বন করিবার পূর্ব্বে, আমার মৃত্যু হল না কেন? একবার যদি এঁকে পাই, আমি সব ছেড়ে দিয়ে, সব সাধ সব আশা সব কামনা ওই পদতলে ঢেলে দিয়ে দাসী হয়ে এঁর পদ সেবা করি। আহা মরি মরি! কি রূপ! কি চাহনি! কি সরলতা! কি মধুরতা!"

নলিনীনাথের রূপ দেখিয়া মমতাজ পাগলিনী হইল। সে প্রতিজ্ঞা করিল, যেমন করিয়া হউক নলিনীনাথকে সে ভুলাইবে। নলিনীনাথকে সে তাহার আপনার করিয়া লইবে। বাজে বাজুক তাহাতে তাহার ভগিনীর

হৃদয়ে দারুণ ব্যথা। যায় যাক্ তাহাতে মহামায়ার হৃদয় শতখণ্ডে চূর্ণ হইয়া। মহামায়া কি নলিনীনাথের উপযুক্ত স্ত্রী। সে বালিকা। সে সরলা। সে প্রকৃতি-পালিতা বনবিহারিণী হরিণী। সে অযত্ন-লালিতা বনলতা। উদ্যানে তাহাকে মানাইবে কেন ?

প্রণয়ের কালকূট যখন হৃদয়ে প্রবেশ করে তখন মানুষ এমনই হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হয়।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

বারাঙ্গনার শিল্পে ও চাতুর্য্যে মমতাজ সিদ্ধহস্ত ছিল। কিন্তু নলিনীনাথকে মুগ্ধ করিবার সমস্ত প্রয়াসই তাহার নিষ্ফল হইল। তাহার কারণ—মমতাজের একটু ক্ষুদ্র ভ্রম। মমতাজ এতদিন যে সকল জীবের উপর দিয়া তাহার বারাঙ্গনা-কলার অনুশীলন করিয়াছে, এবং যাহাদিগকে অতি সহজে তাহার প্রণয়বাগুরায় আবদ্ধ করিতে সমর্থ হইয়াছে তাহারা কেহই তাহার নিকট হৃদয় আদান প্রদানের জন্য যায় নাই। গিয়াছে মূল্য দিয়া রূপ কিনিতে। গিয়াছে অর্থের বিনিময়ে স্ফূর্ত্তি কিনিতে। প্রাণ তাহারা খোঁজেও নাই। প্রাণ তাহারা পায়ও নাই। পেট ভরিয়া মিষ্টান্ন খাইলে কি কখনও পিপাসা মিটে? যতই স্নিগ্ধ হউক না, সলিলে তো ক্ষুধা তৃপ্ত হয় না। প্রাণ চাহে প্রাণ। সম্ভোগ চায় না। ভোগী চাহে ভোগ্য। প্রাণ তাহার আকাঙ্ক্ষার সামগ্রী নহে। কিন্তু পুরুষই হউক, আর রমণীই হউক, হৃদয় যখন আছে, তখন তাহার বিনিময় সে চাহে। তাহা

পাইলেই তাহার সুখ। না পাইলে তাহার অতৃপ্ত। সেই জন্য মমতাজ অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারিণী হইলেও, হতভাগিনী। মহামায়া জীর্ণ কুটীর-বাসিনী হইলেও রাজ-রাজেশ্বরীর সম্পদে সম্পন্না।

মমতাজ যখন দেখিল যে তাহার হাবভাবে নলিনী-নাথকে মুগ্ধ করিবার চেষ্টা ফলবতী হইল না, তখন, একদিন নলিনীনাথকে একান্তে পাইয়া, সে আবেগে আপনার হৃদয়ের সমস্ত কথা তাঁহার নিকট প্রকাশ করিল। এবং তীব্র আকাঙ্ক্ষার প্ররোচনে সে একেবারে যাইয়া নলিনীনাথের বক্ষঃস্থলে ঝাঁপ দিয়া পড়িল। নলিনীনাথ ঘৃণাভরে তাহাকে দূরে সরাইয়া দিলেন। এইরূপে প্রত্যাখ্যাতা হইয়া মমতাজ নিরুদ্ধবীর্য্য ফণিনীর মত রোষে গর্জ্জিতে লাগিল। নলিনীনাথ সেখান হইতে প্রস্থান করিলেন।

মমতাজ অনেকক্ষণ সেইখানে একাকী বসিয়া রহিল। ক্রোধে ও অপমানে, সে তাহার হৃদয়ে দারুণ বেদনা অনুভব করিতে লাগিল। তাহার পঞ্জর ভাঙ্গিয়া দীর্ঘশ্বাস বহিতে লাগিল। তাহার নাসারন্ধ্র স্ফীত হইয়া উঠিল। তাহার

চক্ষু ফাটিয়া জল বাহির হইতে লাগিল। সে মনে মনে এই অপমানের প্রতিশোধ লইবার জন্য কত কি উপায় কল্পনা করিতে লাগিল।

কিছুক্ষণ এইভাবে থাকিয়া মমতাজ যেন একটু আশ্বস্তা হইয়া সেখান হইতে উঠিয়া গেল। তাহার মুখে শয়তানের মত স্থির প্রতিজ্ঞার চিহ্ন। তাহার অক্ষি-কোণে ঈর্ষা ও প্রতিহিংসার ভ্রুকুটিলীলা ও তীব্র বহ্নিজ্বালা।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

পার্ব্বতীয়গণ পুরুষ রমণীতে, পিতা পুত্রে, ভ্রাতা ভগ্নীতে, শ্বশুর জামাতায় একসঙ্গে বসিয়া মদ্যপান করে। ইহা পার্ব্বতীয় সমাজে দূষণীয় বা নিন্দনীয় হয় না। বরং এরূপ আমোদে কেহ যোগদান না করিলে, সে সামাজিক নিয়মকে তাচ্ছিল্য করিতেছে বলিয়া, তাহার চরিত্র নিন্দার্হ হয়।

সংসর্গ মানুষের চরিত্রে পরিবর্ত্তন আনে। নলিনীনাথ পূর্ব্বে কোন মাদক সেবন করিতেন না। এক্ষণে তিনি পাহাড়ীয়াদিগের সহিত রীতিমত মদ্যপান করেন।

মমতাজ নলিনীনাথের বড় শ্যালিকা। সেই জন্য তাহার অনুরোধ এড়াইতে না পারিয়া নলিনীনাথ ক্রমে ক্রমে অতিরিক্ত মদ্যপ হইয়া পড়িয়াছেন।

একদিন সন্ধ্যার পরে প্রাঙ্গণে বসিয়া সকলে মিলিয়া এইরূপ মদ্যপান চলিতেছে। মমতাজ নিজহস্তে পানপাত্র পূর্ণ করিয়া সকলকে মদ্য দিতেছে। যতই রাত্রি হইতে লাগিল, ততই নেশা ও আমোদ জমিতে লাগিল।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

মমতাজ, ইচ্ছা করিয়া, মহামায়া ও নলিনীনাথকে ঘন ঘন মদ দিতে লাগিল। তাহার মৎলব দুইজনকে মাতাল করিয়া ফেলা। সে কিন্তু নিজে খুব অল্প পরিমাণে খাইতে লাগিল। ক্রমে মমতাজ যখন দেখিল যে তাহাদের দুইজনেরই নেশা বেশ পাকিয়া আসিয়াছে, তখন সে তাহার অঞ্চল হইতে একটা কাগজের মোড়ক বাহির করিয়া একটা কি চূর্ণবস্তু তাহাদের মদ্যে মিশাইয়া দিল। নেশার ঝোঁকে তাহারা বুঝিল না, যে মদ্যের সহিত অন্য কোন জিনিস মিশ্রিত করিয়া দিয়াছে। ইহার কিছুক্ষণ পরেই তাহারা দুইজনেই একেবারে অচেতন হইয়া পড়িল। তখন সকলেরই মাতাল অবস্থা। সেইজন্য, নলিনীনাথ ও মহামায়ার এই অস্বাভাবিক অবস্থান্তর কেহই লক্ষ্য করিল না।

মমতাজের সহিত দুইজন মুসলমান অনুচর ছিল। ইহারা দিল্লীর দুইজন নামজাদা গুণ্ডা ও খুনে। যখন সকলে নেশার ঝোঁকে ঘুমাইয়া পড়িল, অথবা স্থানান্তরে গেল, তখন মমতাজ তাহার অনুচরদ্বয়কে ডাকিয়া নলিনীনাথকে দেখাইয়া চুপি চুপি কহিল "ইহার মুখ বাঁধিয়া

একেবারে শিবিকার মধ্যে লইয়া ইহাকে আটকাইয়া ফেল গিয়া। আমিও এখনই আসিতেছি। বাহকদিগকে প্রস্তুত করিয়া রাখিও। আমি আসিবামাত্র এখান হইতে রওনা হওয়া চাই।"

অনুচরদ্বয় সেলাম করিয়া কহিল "বাইজী! সব ঠিক আছে।"

মমতাজের আদেশমত সেই অবস্থায় নলিনীনাথকে স্থানান্তরিত করা হইল। কেহই জানিল না, যে ব্যাপারটি কি ঘটিল।

পরদিন প্রভাতে উঠিয়া মহামায়ার পিতামাতা ও আত্মীয় স্বজনগণ সকলেই একবাক্যে অপরিণামদর্শিতার জন্য মহামায়াকে দোষ দিতে লাগিল। সকলে মিলিয়া তাহাকে বুঝাইতে চেষ্টা করিল যে, পর কখনও আপন হয় না। তেলে জলে মিশে না। বিদেশী বাবু চিরদিনই বেইমান হয়। মহামায়া মুখ ফুটিয়া একটি কথাও কহিল না। তাহাদের কথার কোন উত্তরই সে দিল না। তাহাদের কোনও কথায় সে বিশ্বাসও করিল না। মন নারায়ণ। ব্যাপারখানা যে কি —তাহার মনই তাহাকে বলিয়া দিল! কেমন করিয়া মহামায়া

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

তাহার হারানিধি ফিরিয়া পাইবে, সে সম্বন্ধে সে কাহারও পরামর্শ লইল না। কাহারও সহিত যুক্তিও সে করিল না। যখন এই ব্যাপার লইয়া পল্লীতে তুমুল আন্দোলন চলিতেছে, মহামায়া তখন তাহার জন্মভূমি ও পালয়িত্রী বিশ্বম্ভরী পার্ব্বত্য প্রকৃতির নিকট চিরবিদায় লইয়া সঙ্কীর্ণ ও দুর্গম পার্ব্বত্য পথ বাহিয়া 'ময়দেশ' অভিমুখে যাত্রা করিয়াছিল।

সে ঠিক বুঝিয়াছিল, যে তাহার ভগ্নী তাহার স্বামীর উপর অনুরাগিণী হইয়া কৌশলে তাহাকে অপহরণ করিয়া লইয়া গিয়াছে। দিল্লীতে গিয়া, হয় মহামায়া রাক্ষসী ভগ্নীর কবল হইতে তাহার হারাধন ফিরাইয়া আনিবে। আর তাহা না পারিলে, কালিন্দীর জলে, এ জন্মের মত, সে তাহার শোকতাপ ডুবাইয়া দিবে।

মহামায়ার মুখে কথা নাই। চোখের জল অনবরত পড়িয়া, তাহার কপোলদ্বয় গণ্ডস্থল ও বক্ষঃস্থলের বসন দিন-রাত আর্দ্র করিয়া রাখিয়াছিল। গিরি নির্ঝরিণীর সলিলের ভাণ্ডার যেমন অফুরন্ত, মহামায়ার চোখের জলের প্রস্রবণও সেইরূপ অফুরন্ত।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

সেই দিনই সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে মহামায়া হরিদ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইল।

নাট্যকার, ঘটনার পর ঘটনা গাঁথিয়া, নাটক রচনা করিয়া তাহার কৃতিত্ব দেখায়। বিশ্বস্রষ্টা, তাঁহার প্রপঞ্চ এই জগতের নাট্যশালায়, তাঁহার সৃষ্ট মানবের প্রত্যেকের সম্বন্ধেই, প্রত্যেক মুহূর্ত্তে, এইরূপ নূতন নাটক রচিতেছেন। সেই বিশ্বনাট্যের অধ্যক্ষ বিশ্বম্ভরের কৌশলে, হরিদ্বার পৌঁছিয়াই মহামায়ার সহিত প্রথম সাক্ষাৎ হইল, প্রভার।

নলিনীনাথ তাঁহার মাতৃদত্ত রত্নহার মহামায়ার সহিত প্রথম সাক্ষাতের রাত্রেই তাহার গলায় পরাইয়া দিয়াছিলেন। সেই অবধি সে হার মহামায়ার গলায়ই ছিল। প্রয়োজন হইলে, মহামায়া বরং তাহার পঞ্জরের অস্থিগুলি এক একখানি করিয়া খুলিয়া দিতে পারিত, বরং তাহার শরীরের বিন্দু বিন্দু রক্ত সে অকাতরে দান করিতে পারিত, কিন্তু তাহার স্বামীদত্ত রত্নহার অন্নাভাবে মরিলেও সে তাহার কণ্ঠচ্যুত করিতে পারিত না।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

মহামায়ার অসংযত বেশভূষা, অবিন্যস্ত রুক্ষ কেশপাশ, রোদনারুণিত চক্ষুর্দ্বয়, অশ্রু-কলঙ্কিত মুখ দেখিয়া সকলেই মনে করিল, যুবতী পাগলিনী। তাহার গলার হার মূল্য-হীন। রাস্তা হইতে কুড়ান কাচ-দ্বারা রচিত। ইহাও সূক্ষ্ম দূরদর্শিনী নিয়তিরই বিধান। তাহা না হইলে, এই অসহায়া রমণীকে দস্যু তস্করের হাত হইতে রক্ষা করিত কে? আর নলিনীনাথের জীবন-নাট্যের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সূত্র এই রত্ন-মালাটী ছিন্ন ও অপহৃত হইলে অভিনয় সমাপনই বা হয় কেমন করিয়া? সে সূত্র, সেই নিদর্শন, বরাবর অবিচ্ছিন্ন ও অটুট রাখিবার ভার, পরমমঙ্গলময় বিশ্বনাট্যের অধ্যক্ষ সেই বিরাট পুরুষের উপর।

পাগলিনী মহামায়াকে দেখিয়া করুণাপরবশ হইয়া কোনও গৃহস্থ তাহাকে কিছু খাদ্য দিতে গেল। পাগলিনী তাহা স্পর্শও করিল না। কেহ পয়সা ভিক্ষা দিতে গেল, সে সেদিকে ফিরিয়াও চাহিল না। দলে দলে পল্লীবালকগণ এই বিশেষত্বময়ী পাগলিনীর পাছে লাগিয়া তাহাকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিল।

রাজপথে জনতা দেখিয়া ও কোলাহল শুনিয়া, প্রভা

বাতায়নের মধ্য হইতে মুখ বাড়াইয়া ব্যাপার কি দেখিতে গেল। পাগলিনীর গলায় তাঁহার স্বামীর মুক্তাহার দেখিয়া তাহার শরীরের প্রতি শিরা উপশিরায় তড়িদ্বেগে রক্তস্রোত প্রবাহিত হইতে লাগিল। তাহার বক্ষের স্পন্দনে ঢেঁকির পাড়ের মত শব্দ হইতে লাগিল। সে লজ্জা সরম পরিত্যাগ করিয়া ছুটিয়া রাজপথে বাহির হইল। জনতা ঠেলিয়া বরাবর পাগলিনীর নিকট গিয়া, তাহাকে বাহুপাশে জড়াইয়া ধরিয়া প্রভা একেবারে হিড়্ হিড়্ করিয়া টানিয়া তাহাকে বাড়ীর মধ্যে লইয়া আসিল। এই ঘটনাটি এরূপ তাড়াতাড়ি ঘটিল যে সকলেই অবাক হইয়া গেল। কেহ ইহার কোন প্রতিবাদ করিবার অবসর পাইল না।

বাড়ীর মধ্যে লইয়া আসিয়া প্রভা আর একবার পাগলিনীর গলার রত্নমালাছড়াটি ভাল করিয়া দেখিয়া লইল। দেখিল—যে সন্দেহের কোন কারণ নাই। এ তাহার স্বামীরই রত্নহার। নানা অমূলক কল্পনা চিন্তা ও ভয় প্রভার হৃদয়কে আকুলিত করিয়া তুলিল।

সে উৎসুকভাবে পাগলিনীকে জিজ্ঞাসিল "বহিন! তুমি তোমার গলার ওই হারছড়াটি কোথায় পাইলে?"

মহা। কেন! আমার বর ইহা আমাকে দিয়াছে।

প্রভা। তোমার বর কে? কোনও পার্ব্বতীয় যুবা কি?

মহা। না—আমার বর বাবুজী। তিনি বাঙ্গালী।

প্রভার বুক ধড়াস্ ধড়াস্ করিতে লাগিল। সে জিজ্ঞাসা করিল "তোমার বিবাহ কবে হইয়াছে।"

মহা। বারো তেরো দিন পূর্ব্বে।

আর সন্দেহের কারণ কোথায়?

প্রভা জিজ্ঞাসা করিল "তোমার বর এখন কোথায়?"

মহা। তাঁকে আমার দিদি চুরি করে নিয়ে গেছে।

বর চুরি হয়! প্রভা নিদারুণ দুঃখের মধ্যেও, এই পার্ব্বত্য যুবতীর বালিকা-সুলভ সরলতায় না হাসিয়া থাকিতে পারিল না।

প্রভা। তোমার দিদি তাকে চুরি করে নিয়ে গেল কেন? তার কি নিজের বর নেই।

মহা। সে যে বাইজী। তার বর থাকবে কেমন করে?

রহস্য ক্রমে জটিল হইয়া আসিল। প্রভার মুখে

চিন্তার মেঘ আরও ঘনাইয়া উঠিল। প্রভা জিজ্ঞাসিল "তোমার দিদি কোথায় থাকেন?"

মহা। দিল্লীতে। তাহার নাম আগে ছিল—শান্তমায়া। এখন তাহার নাম—মমতাজ বাইজী। তার অনেক টাকা কড়ি, অনেক গহনা কাপড়। তা হলেও, আমার বর তাকে চায় না। আমাকেই চায়। সেই রাগেই তো সে আমার বরকে চুরি করে নিয়ে গেছে। আমি আমার বরকে তার হাত থেকে ছিনিয়ে আন্‌তে যাচ্ছি।

রমণীর প্রেমের মূর্ত্তি ভিন্ন ভিন্ন। কোনওটির সহিত কোনওটির সম্পূর্ণ মিল থাকে না। কিন্তু প্রেমের এ মূর্ত্তি সম্পূর্ণ নূতন। ইহার আগা হইতে গোড়া পর্য্যন্তের মধ্যে, একটা বিশেষত্ব প্রভা দেখিতে পাইল। সে পাগলিনীকে আশ্বাস দিয়া কহিল "বহিন! তুমি একলা পারিবে না। চল, আমিও তোমার সঙ্গে যাই। দু' জনে, এক সঙ্গে মিলে, তোমার বরকে ধরে আন্‌বো।"

মহামায়া বিস্মিত হইয়া কহিল "সত্যি! তবে এখনই চল।"

প্রভা কহিল "এখনই?"

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

মহামায়া দৃঢ়ভাবে উত্তর দিল "এখনই।" তাহার মুখে স্থির প্রতিজ্ঞার চিহ্ন।

প্রভা ভাবিল, এ কি কোনও স্বর্গের দেবী তাহাকে তাহার কর্ত্তব্য পালনে উৎসাহিত ও স্থিরপ্রতিজ্ঞ করিবার জন্য এই পার্ব্বত্য রমণী মূর্ত্তিতে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন।

প্রভা মহামায়াকে লইয়া সেই দিনই দিল্লী যাত্রা করিল।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

মমতাজের ব্যবহারে নলিনীনাথ প্রথমে তাহার উপর বড়ই রুষ্ট হইয়াছিলেন। কিন্তু সে যখন কথায়-বার্ত্তায় কার্য্য-কলাপে বুঝাইয়া দিল, যে নলিনীনাথের উপর তাহার অকৃত্রিম অনুরাগই তাহার ঐ সকল নীচ কৌশল অবলম্বনের হেতু, তখন তাঁহার ক্রোধ ক্রমশঃ শান্ত হইয়া আসিল।

রমণীর সাধা দান পায়ে ঠেলিয়া ফেলিয়া দেয়, এরূপ সামর্থ্য কয়জন পুরুষের আছে? নলিনীনাথও মমতাজকে তাহার কাতর-যাচিত ভিক্ষা না দিয়া থাকিতে পারিলেন না।

নলিনীনাথকে পাইয়া, মমতাজ তাহার ব্যবসা এক-প্রকার ছাড়িয়া দিয়াছিল। অর্থের অভাব তাহার ছিল না। সে নলিনীনাথকে বিলাস আমোদ ও যত্নের সমুদ্র মধ্যে ডুবাইয়া ভুলাইয়া রাখিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। আমোদের স্রোতে গা ঢালিয়া, গানের স্বপ্নে ও মদিরার মোহে ডুবিয়া থকিয়া, নলিনীনাথ প্রতিমুহূর্ত্তেই এক এক পাদ

করিয়া নরকের পথে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। মহামায়াকে পাইয়া তিনি প্রভাকে ভুলিয়াছিলেন। মমতাজকে পাইয়া তিনি মহামায়াকে ভুলিলেন।

দিল্লীতে আসিয়া মমতাজ বাইজীর সন্ধান করিতে প্রভাকে তত বেগ পাইতে হইল না। মমতাজ তখন দিল্লীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বাইজী। দিল্লীতে পৌছিয়াই প্রভা অজস্র অর্থব্যয়ে একদল গোয়েন্দা ঠিক করিয়া, বাইজীর সম্বন্ধে বিস্তারিত খবর সংগ্রহ করিতে লাগিল। প্রভা সঠিক জানিল যে, নলিনীনাথ যে কেবল মমতাজ বাইজীর প্রণয়বাগুরায় আবদ্ধ, কেবল তাহাই নহে। তিনি এখন বাইজীর মর্ম্মরময় হর্ম্ম্যের কারায় প্রকৃত নজরবন্দী কয়েদী। তাঁহার সেখান হইতে বাহির হইবার ক্ষমতা নাই। বাড়ীর ফটক বহু প্রহরী দ্বারা দৃঢ় ও সুশৃঙ্খল ভাবে পরিরক্ষিত। বল-বিজ্ঞানের সর্ব্বপ্রথম সূত্র হইতেছে এই যে, একটি বলের শক্তি ও ক্রিয়া প্রতিহত ও নষ্ট করিতে হইলে, তাহার বিপরীত দিকে একটি তদনুরূপ অথবা তদধিক বল দিতে হইবে। নলিনীনাথ এক্ষণে মমতাজের রূপ, যৌবন, সোহাগ, আদর,

যত্ন ও ভালবাসার আকর্ষণে আকৃষ্ট। নলিনীনাথের স্কন্ধে এক্ষণে প্রেতিনী ভর করিয়াছে। তাহাকে নামাইতে হইলে অনেক ধুলা-পড়া সরিষা-পড়ার প্রয়োজন। প্রভার সহিত একবার চাক্ষুষ দেখা-শুনা না হইলে, নলিনীনাথের এই উৎকট ব্যাধি-মুক্তির অন্য কোনও উপায় নাই।

রমণীর কার্য্যকরী শক্তি, বুদ্ধির স্থিরতা ও কৌশল অনেক সময় পুরুষের শক্তিকেও হারি মানাইয়া দেয়। তাহার অভীষ্ট সাধন কল্পে প্রভা থাকিয়া থাকিয়া একটি সুন্দর কৌশল উদ্ভাবিত করিল। সে অজস্র অর্থব্যয়ে মমতাজের দাস দাসী দরোয়ান পাচক প্রভৃতি সমস্ত লোকগুলিকে প্রথমে হাত করিয়া লইল। তাহারা এরূপ বশীভূত হইল, যে প্রভার কথায় তাহারা মমতাজেরও গলায় ছুরি দিতে পশ্চাৎপদ হইত না।

তাহার পর অবসর বুঝিয়া ও পূর্ব্ব হইতে সমস্ত খবর লইয়া একদিন প্রভা পুরুষবেশে মমতাজের বাড়ীতে গিয়া উপস্থিত হইল।

প্রভার গাড়ী যখন মমতাজের বাটীর দ্বারে গিয়া লাগিল, মমতাজের কক্ষ তখন উৎসবের আলোকে

আলোকিত, বিলাসের হিল্লোলে আন্দোলিত, গীতের মূর্চ্ছনায় ঝঙ্কৃত ও মুখরিত।

বারুণী-সেবনে মমতাজের হৃদয়ের সমস্ত কবাটগুলিই তখন খুলিয়া গিয়াছে। সেই উন্মুক্ত দ্বারপথে তাহার প্রাণ-পাখীটি তখন তাহার প্রাণদেবতাকে বেড়িয়া বেড়িয়া উড়িয়া বেড়াইতেছে। প্রণয়ের ঐন্দ্রজালিক স্পর্শে বারাঙ্গনাসুলভ চাতুর্য্য ও কপটতা তখন মমতাজের হৃদয় হইতে একেবারে অন্তর্হিত হইয়াছে। তানলয়বিশুদ্ধ কণ্ঠে দিঙ্মণ্ডল পূর্ণ করিয়া সুকণ্ঠী মমতাজ তখন গান ধরিয়াছে—

আজ কেন বঁধু! অধর কোণেতে
　　শুকানো হাসির রেখা?
মরমের হাসি চুরি কে করেছে—
　　বল গো পরাণ সখা!
কেন শূন্য আঁখি নেহারি?
　　ব্যাকুল চাহনে, সব কি দিয়েছ,
যা ছিল সরমে মাখা?
　　কার ছায়া জাগে মরমে?
নিমেষে ফুরাল জনমের সাধ
বরষে বরষে আঁকা!

গীতের অক্ষরে অক্ষরে স্বর্গীয় সুধা ক্ষরিত হইতে-ছিল। তাহার ছন্দে ছন্দে শ্রোতাগণের প্রাণ নাচিয়া উঠিতেছিল।

প্রভা এতক্ষণে একেবারে নিঃসন্দিগ্ধ হইল। এ গীত যে তাহার বড় পরিচিত। এ গীত যে নলিনীনাথ কৌমুদী প্লাবিত মলয় সমীর সেবিত তাঁহাদের ফুলশয্যার রজনীতে প্রভার কাছেই গাহিয়াছিলেন। যে গীত সে দিন প্রভার শিরায় শিরায় অমিয়ারস ঢালিয়া দিয়াছিল, আজ জানি না কেন, তাহারই প্রত্যেকটি ছন্দ তীক্ষাগ্র ভল্লের মত প্রভার বক্ষোবন্ধ অযুত খণ্ডে দীর্ণ করিল। প্রভা গাড়ীতে বসিয়া কাতর ঔৎসুক্যে সেই গান শুনিতে লাগিল।

সুরের শেষ রেশ্ না মিলাইতে মিলাইতে আবার মমতাজ গান ধরিল—

এস হে প্রাণ! হৃদয় ধন!
হেরিব তোমারে ভরিয়ে নয়ন!
তোমারি তরে সে হৃদি বিদরে;
আঁখিনীরে সদা ভাসে নয়ন।
কত কেঁদেছি বুক বেঁধেছি
তোমা লাগিয়ে কত সয়েছি!

নয়নবারি এস নিবারি—
মুখ পাসরি (তোমায়) করি হে চুম্বন।*

দ্বারবান উপরে গিয়া বাইজীকে জানাইল যে একজন পশ্চিম দেশীয় রাজপুত্র বাইজীর সহিত কয়েক মিনিটের জন্য দেখা করিতে চাহেন। নলিনীনাথ কহিলেন "ভদ্রলোক দেখা করিতে চাহিতেছেন। দেখা করিতে দোষ কি ? তাঁহাকে এখানেই আসিতে বল।"

দ্বারবান গিয়া সেই কথা বলিল। পুরুষ-বেশে প্রভা আসিয়া সেই কক্ষে প্রবেশ করিল। প্রভাকে দেখিয়াই নলিনীনাথ বিস্মিত ও হতবুদ্ধির ন্যায় ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া চাহিয়া রহিলেন।

প্রভা বরাবর নলিনীনাথের নিকট গিয়াই তাঁহার হাত চাপিয়া ধরিয়া কহিল "আমার সঙ্গে এস।" নলিনীনাথ যন্ত্র-পরিচালিতের ন্যায় প্রভার সঙ্গে বাহির

* মদ্‌রচিত এই গীত দুইটি বহুদিন হইতে সাধারণ্যে গীত ও আদৃত হইয়া আসিতেছে। আমার 'রিজিয়ার' কয়েকটী গীত ও এই গীত দুইটির সহিত, আমার কতিপয় কৈশোর-সুহৃদের অমৃতময়ী স্মৃতি ওতপ্রোতভাবে বিজড়িত আছে। সেই স্মৃতিটিকে চির-জাজ্জল্য ও জাগরূক রাখিবার প্রয়াসই, এই গীত দুইটিকে এখানে সন্নিবেশিত করার একমাত্র কারণ।

হইয়া গেলেন। ব্যাপারটি এত অকস্মাৎ ঘটিল যে মমতাজ কোন বাধা দিবার অবসর পাইল না। চাকর-বাকর দরোয়ানগণ তো পূর্ব্ব হইতেই প্রভার বশ হইয়াছিল। তাহারা ইচ্ছা করিয়াই নলিনীনাথ ও প্রভার পলায়নে কোন বাধা দিল না।

মমতাজ নিষ্ফল ক্রোধে পরিচারক ও দরোয়ান-দিগের উপর তর্জ্জন গর্জ্জন করিতে আরম্ভ করিল।

তখনই গাড়ী যুতিতে হুকুম দিয়া, মমতাজ অধীর-ভাবে অপেক্ষা করিতে লাগিল। গাড়ীতে উঠিয়া সে দিল্লীর পথে পথে ঘুরিয়া ঘুরিয়া নলিনীনাথের সন্ধান করিতে লাগিল।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

মমতাজের বাটী হইতে নলিনীনাথকে সঙ্গে লইয়া বাহির হইয়া, প্রভা কোচম্যানকে দিল্লী রেলওয়ে ষ্টেসনে যাইতে আদেশ দিলেন। তাঁহারা যখন ষ্টেসনে পৌছিলেন তখনও কলিকাতার গাড়ী ছাড়িবার আর আধ ঘণ্টা দেরী আছে। প্রভা তাহার জামার পকেট হইতে দুইখানি একশত টাকার নোট বাহির করিয়া দিলেন। নলিনীনাথ দুইখানি কলিকাতার জন্য প্রথম শ্রেণীর টিকিট কিনিয়া আনিলেন। ওয়েটিং-রুমে বসিয়া দুইজনে কথোপকথন হইতে লাগিল।

নলিনীনাথ তাঁহার আনুপূর্ব্বিক ইতিহাস বিবৃত করিয়া প্রভাকে জিজ্ঞাসা করিলেন "তুমি এখানে আমার সন্ধান পেলে কি করে?"

প্রভা। হরিদ্বারে একজন ভিখারিণীর গলায় তোমার মুক্তার মালা দেখে।

নলি। ভিখারিণী! কে সে? তাহার নাম তুমি জান?

প্রভা। জানি—তাহার নাম মহামায়া। এই রমণীর সম্বন্ধে আরও একটি কথা আমি জানি। তুমি তাহাকে বিবাহ করিয়াছ।

নলিনীনাথ লজ্জায় বদন নত করিলেন।

প্রভা তাহা বুঝিতে পারিয়া কহিল "তাহাতে দোষ কি, প্রিয়তম? হিন্দুসমাজে বহু-বিবাহ তো দোষের নহে। ভালকথা! আমি আমার অত্যধিক সৌভাগ্যে, অত্যধিক আনন্দে, আমার একটি প্রধান কর্ত্তব্য ভুলে গিয়েছি। যাহার জন্য আমি তোমাকে ফিরে পেলাম, আমি এত অকৃতজ্ঞ, যে আমি তার কথা সম্পূর্ণরূপে ভুলে গিয়েছি।"

নলি।। সে ভালই হয়েছে। প্রভা! আমি এখনও বুঝ্‌তে পারছি না, যে আমি জীবিত অথবা মৃত। জাগ্রত কিম্বা নিদ্রিত। আমি কি যেন একটা ভয়াবহ নরক-কুণ্ডে ডুবেছিলাম। কল্যাণি! তুমি আজ আমাকে সেই নরক হ'তে উদ্ধার করে এনেছ।

প্রভা। প্রিয়তম! শান্ত হও। এতে তোমার কোনও দোষ নাই। সব আমার অদৃষ্টের দোষ।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

অনুতাপে পাপের শাস্তি। পাপের শাস্তি হইয়াছে। এখন সব দিকেই ভাল হইবে।

স্বামী-স্ত্রীতে এইরূপ কথোপকথন হইতেছে এমন সময় গভীর নিক্কণে ঘণ্টাধ্বনি হইল। মেদিনী কম্পিত করিয়া হুস্ হুস্ শব্দে পঞ্জাব মেল আসিয়া দিল্লী ষ্টেসনের প্লাট্‌ফরমে লাগিল। নলিনীনাথ ও প্রভা একটি শূন্য ফার্ষ্টক্লাসের কামরা পাইয়া তাহাই গিয়া দখল করিয়া বসিলেন।

নলিনীনাথ জানালা দিয়া মুখ বাড়াইয়া প্লাট্‌ফরমের দিকে চাহিয়া ছিলেন। সহসা দেখিলেন, দুইজন রমণী ব্যস্ত-সমস্ত হইয়া প্লাটফরমের শেষ প্রান্ত হইতে আরম্ভ করিয়া সমস্ত গাড়ীগুলি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরীক্ষা করিতেছে। দেখিবামাত্র নলিনীনাথ ইহাদিগকে চিনি-লেন। ভয়ে তাঁহার মুখ শুকাইয়া গেল। তাঁহার গা শিহরিয়া উঠিল। মমতাজ কেমন করিয়া মহামায়ার দেখা পাইল? আর কোন্ সূত্র ধরিয়াই বা তাহারা উভয়ে নলিনীনাথের পশ্চাদনুসরণ করিল?

পঞ্জাব মেলটী ভয়ানক লম্বা। অর্দ্ধেক গাড়ী খোঁজা

শেষ হইতে না হইতেই, এঞ্জিন হুইস্‌ল্ দিল। গাড়ী ছাড়িয়া দিল। মমতাজ ব্যর্থ-মনোরথ হইয়া, রাগের জ্বালায়, মহামায়াকে বিষম জোরে এক ধাক্কা দিয়া ফেলিয়া দিল। কহিল "শয়তানি! তোর জন্যই তো আমার এই সর্ব্বনাশ হ'ল। যা—তুই জাহান্নমে যা!"

তখন ট্রেন্ চলিতে আরম্ভ করিয়াছে। ধাক্কা খাইয়া, মহামায়া প্লাট্‌ফরমের শানের উপর উবুড় হইয়া পড়িয়া গেল। তাহার ললাটে বিষম আঘাত লাগিল। নলিনীনাথ দেখিলেন যে মহামায়ার তুষারের মত শুভ্র ললাট ফাটিয়া দরদর ধারে রক্ত পড়িতেছে ও সেই রক্তে মহামায়ার বসনাঞ্চল সিক্ত হইতেছে। তাহার গলায় তখনও সেই মুক্তাহার। সেই হারের মুক্তাগুলিও সমস্ত রক্ত-রঞ্জিত।

প্লাটফরমে যে ঘটনা ঘটিয়াছিল, প্রভা তাহার কিছুই দেখিতে পান নাই। তিনি গাড়ীর অপর পার্শ্বস্থ আসনে বসিয়া জানালা দিয়া মুখ বাড়াইয়া সাত পাঁচ ভাবিতেছিলেন। নলিনীনাথ-ও ঘটনাবলীর আকস্মিকতায় এতদূর হতবুদ্ধি হইয়াছিলেন, যে গাড়ী না ছাড়া পর্য্যন্ত,

তাঁহার আদৌ বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না। ট্রেন ছাড়িয়া দিলে, তিনি প্রভার দিকে চাহিয়া কহিলেন "প্রভা! বড় অন্যায় কাজ হইয়া গিয়াছে। মহামায়া ও মমতাজ উভয়ে ষ্টেসন পর্য্যন্ত আমাদের পশ্চাদনুসরণ করিয়াছিল। আমি স্বচক্ষে তাহাদিগকে দেখিয়াছি।"

"আমাকে সে কথা বলিলে না কেন?"

"অবসর পাইলাম কই? শুন প্রভা! আরও যাহা ঘটিয়াছে। তাহা শুনিলে তুমি হৃদয়ে দারুণ বেদনা পাইবে। আমাদের দেখিতে না পাইয়া, সেই প্রতিহিংসা-পরায়ণা ঘৃণিতা পিশাচী মমতাজ বিষম জোরে এক ধাক্কা দিয়া মহামায়াকে ফেলিয়া দিল। শানে পড়িয়া গিয়া, তাহার কপাল ফাটিয়া দরদর ধারে রক্ত পড়িতে লাগিল। রক্তে তাহার কাপড় ভিজিয়া গেল। তাহার গলায় সেই রত্নহার। তাহাও রক্ত-সিক্ত।"

"যা হ'ক, এখন আর নিশ্চেষ্ট থাকিলে চলিবে না। এই পার্ব্বত্য রমণী যখন, একদিনের জন্য, এক মূহুর্ত্তের জন্য, তোমার অঙ্ক-স্বর্গে স্থান পাইয়াছে, তাহাকে সে অধিকার হইতে একেবারে বঞ্চিত করিবার সামর্থ্য

আমার নাই। আমরা হিন্দু রমণী। স্বার্থত্যাগই আমাদের প্রণয়ের বীজমন্ত্র। এই সরলাকে রক্ষা তোমাকে করিতেই হইবে। আমি আমার কনিষ্ঠা ভগ্নির মত ইহাকে দেখ্‌বো। তুমি যা হয় ব্যবস্থা কর। যত টাকা লাগে—লও।” এই কথা বলিয়া প্রভা নলিনীর হাতে একতাড়া ভিন্ন ভিন্ন মূল্যের নোট বাহির করিয়া দিল। জল্পনায় কল্পনায় প্রায় অর্দ্ধ ঘণ্টা অতিবাহিত হইল। ট্রেন গাজিয়াবাদ ষ্টেসনে আসিয়া পৌছিল। গাড়ী থামিবামাত্র নলিনীনাথ গাড়ী হইতে অবতরণ করিয়া টেলিগ্রাফ আফিসের দিকে ছুটিয়া গেলেন ও তাড়াতাড়ি নিম্নলিখিত জরুরি তারটি লিখিয়া সিগ্‌ন্যালারের হস্তে দুইখানি দশ টাকার নোট ও তারের ফর্ম্মখানি দিয়া কহিলেন “তারটা বিশেষ জরুরি। এখনই পাঠাইয়া দিন। ইহার খরচ বাদে অবশিষ্ট টাকা—আপনার বক্‌শিস্‌।”

সিগ্‌ন্যালার কথা গণিয়া দেখিল, যে তাহার খরচ পাঁচ টাকারও অনধিক। আশাতীত বক্‌শিস্‌ লাভ করিয়া, সে দু’ হাতে নলিনীনাথকে সেলাম করিয়া কহিল,

"আমি এখনি তারটি পাঠাইয়া দিতেছি।" এই কথা বলিয়া কলের বোতাম টিপিয়া সে 'টরে টক্কা' আরম্ভ করিয়া দিল।

টেলিগ্রামটিতে লেখা ছিল—

Station Master Delhi,

Left behind. At Delhi Railway platform. A young lady. Age about fifteen with a pearl necklace and hill-girls' dress. Wired you Thousand Rupees for expenses. Kindly arrange Escort and send her to Nalininath Rays house No......Camac Street Calcutta Your reward Rupees five hundred.

ষ্টেসন্‌মাষ্টার দিল্লী :—দিল্লীর রেলওয়ে ষ্টেসনে একজন ভদ্রমহিলা ট্রেনে উঠিতে পারে নাই। তাহার বয়স অনুমান পোনর। তাহার পরিচ্ছদ পার্ব্বতীয় রমণীর। গলায় একছড়া মুক্তার হার। খরচের জন্য আপনার নিকট তারে এক হাজার টাকা পাঠান হইল। উপযুক্ত সঙ্গী বন্দোবস্ত করিয়া তাহাকে...নং ক্যামাক্‌ ষ্ট্রীটে নলিনীনাথ রায়ের বাটীতে পাঠাইয়া দিবেন। আপনার পুরস্কার পাঁচশত টাকা।

এই টেলিগ্রামটি যখন দিল্লীর ষ্টেসন-মাষ্টারের হাতে পৌঁছিল, তাহার বহুক্ষণ পূর্ব্বেই, মমতাজ ক্রোধে গরগর করিতে করিতে এবং মহামায়ার উপর অজস্র গালি-বর্ষণ করিতে করিতে আপন বাটীতে ফিরিয়া গিয়াছিল। অসহায়া আশ্রয়হীনা মহামায়া প্লাটফর্‌মের এক কোণে বসিয়া কাঁদিতেছিল। তাহার চারিদিকে ষ্টেসনের কুলিগণ ও বিনামূল্যে পরামর্শদাতা বা সহানুভূতিকারীগণ দাঁড়াইয়া জটলা পাকাইতেছিল। ষ্টেসন মাষ্টার সাহেবকে সেইদিকে আসিতে দেখিয়া, বুটের লাথির ভয়ে, তাহারা বিভিন্ন অভিমুখে প্রস্থান করিল।

সাহেব তারখানি বাম হস্তে লইয়া, দক্ষিণ হস্তে একখানি ছোট সরু ওয়াকিং ষ্টিক্ ঘুরাইতে ঘুরাইতে আসিয়া মহামায়াকে লক্ষ্য করিয়া বিশুদ্ধ বাঙ্গলায় কহিলেন "বিবি! টুমি পশ্চাট্ পড়িয়া আছে। হামি টোমাকে কলিকাটা প্রেরণের জন্য পরামর্শ পাইয়াছে। টুমি পরের গাড়ীটে কলিকাটা যাইবার জন্য প্রস্‌টুট্ হও। হামি একজন বৃঢ্ঢ কেরাণীবাবু ও একটী আয়াকে টোমার সাঠে প্রেরণ করিবে।"

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

মহামায়ার স্বামী তাহা হইলে তাহাকে ভুলেন নাই। তাহার হৃদয় আহ্লাদে নাচিয়া উঠিল। পরের গাড়ীতে উপযুক্ত বন্দোবস্তে মহামায়া নলিনীনাথের কলিকাতার বাটীতে প্রেরিত হইল।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ।

মমতাজ বাড়ীতে ফিরিয়া গেল বটে, কিন্তু তাহার কিছুই ভাল লাগিতেছিল না। প্রণয়াস্পদের অভাবে সংসার তাহার নিকট শ্মশানের মত বোধ হইতে লাগিল। সে রাত্রে তাহার চোখে এক ফোঁটাও ঘুম আসিল না। শয্যা কণ্টকাকীর্ণ বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। কত বার সে আপনার মনকে বুঝাইবার চেষ্টা করিল। সংসারে একজন ছাড়া কি পুরুষ নাই? যখন সহস্র পুরুষের মধ্য হইতে, একটিকে মনোমত বাছিয়া লইবার সুবিধা আমার আছে, তখন কেন আমি অনর্থক ভাবিয়া ভাবিয়া আমার জীবনটিকে বিষময় করিয়া তুলিতেছি! কিন্তু মন সে কথা মানে কই? জাগ্রতে, নিদ্রায়, স্বপ্নে মমতাজের চক্ষের সম্মুখে যে সেই একই মনোমোহন ছবি ভাসিতেছিল। শত চেষ্টায়ও মমতাজ যে তাহা লুপ্ত করিতে পারিতেছিল না।

সমস্ত রাত্রি এইরূপ দুশ্চিন্তায় কাটাইয়া, প্রত্যূষে উঠিয়াই মমতাজ তাহার ভৃত্যগণকে পরিচ্ছদাদি ও

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ।

বাহিরের জন্য আবশ্যক তৈজস পত্রাদি প্যাক করিতে আদেশ দিল। কিছুদিনের জন্য দিল্লী ছাড়িয়া সে কলিকাতায় গিয়া থাকিবে এইরূপ অভিপ্রায় তাহাদিগকে জানাইল। বাইজীর হঠাৎ এরূপ চিত্ত-চাঞ্চল্য ও খামখেয়ালী দেখিয়া তাহারা একটু বিস্মিত হইল।

সেইদিন রাত্রের মেলেই মমতাজ চারিজন ওস্তাদ তিনজন পরিচারক ও একজন পরিচারিকা সঙ্গে লইয়া, কলিকাতা অভিমুখে রওনা হইল। কলিকাতায় আসিয়া মমতাজ মেছুয়া-বাজারের নিকট চিৎপুর রোডে একটি প্রকাণ্ড বাটী ভাড়া লইল। ভাগাড়ে মৃত জানোয়ার পড়িলে গৃধ্রদল যেমন তাহা জানিতে পারে, দিল্লীর সুবিখ্যাত বাইজী মমতাজের আগমনবার্ত্তাও সেইরূপ লম্পট-সমাজের মাথার টনক্ নড়াইয়া দিল। সপ্তাহ অতীত হইতে না হইতেই তাহার বাড়ীর সামনের রাস্তা, গাড়ী যুড়ি মটরের ভিড়ে সাধারণ পথিকের পক্ষে দুর্গমনীয় হইয়া উঠিল।

মমতাজ পূরামাত্রায় ব্যবসার ভাণ আরম্ভ করিয়া, অল্পদিন মধ্যেই তাহার পশার খুব জমাইল বটে। কিন্তু

তাহার গূঢ় উদ্দেশ্য ছিল অন্যরূপ। সে নলিনীনাথের সন্ধান করিতেই কলিকাতায় আসিয়াছিল।

ভগবানের নিকট যে যাহা ঐকান্তিক ভাবে কামনা করে, সে তাহা পায়। মমতাজ নলিনীনাথের সন্ধান পাইবার জন্য একান্তে কামনা করিতেছিল। ঈশ্বর তাহাকে তাহা মিলাইয়া দিলেন।

নলিনীনাথ কলিকাতায় ফিরিয়া আসিয়া একটি বড় লেপাফায় গভর্ণমেণ্টের শিল-মোহরাঙ্কিত একখানি চিঠি পাইলেন। তাহাতে জানিলেন যে তিনি গভর্ণমেণ্ট কর্তৃক 'রাজা' পদবীতে ভূষিত হইয়াছেন। এই সম্মানলাভের সুযোগে প্রজারঞ্জক জমীদার নলিনীনাথ তাঁহার জমীদারীর প্রজা ও জোৎদারগণকে ও জেলার রাজ-পুরুষগণকে সম্মানিত ও সম্বর্দ্ধিত করিবার ইচ্ছায় একটি উৎসবের আয়োজন করিলেন। এই উৎসবের স্থান, তাঁহার পাবনার বাটীতেই নির্ব্বাচিত হইল।

এই উৎসবের জন্য আমোদ-প্রমোদের বন্দোবস্তও নানা প্রকারের হইতে লাগিল। বাইজী-মহলে দালালের হুড়াহুড়ি পড়িয়া গেল। একজন দালাল আসিয়া

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ।

নলিনীনাথের বাটীতে মুজরার জন্য মমতাজ বাইজীকে বায়না করিয়া গেল।

পাঠক বুঝিলেন কি? ইহাও সেই অটুট অলঙ্ঘ্য নিয়তিরই খেলা!

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ।

ফেনিল উচ্ছাসময়ী তরঙ্গবিভঙ্গময়ী পূণ্য-স্রোতস্বতী পদ্মাবতী তীরে, নলিনীনাথের বাটীর সুপরিসর প্রাঙ্গণ-ভূমিতে, বহু অর্থ-ব্যয়ে কলিকাতার একজন নিপুণ ডেকরেটরের তত্ত্বাবধানে একটি প্রকাণ্ড নাট্যশালা রচিত হইয়াছে। তাহা বৈদ্যুতিক আলোকে আলোকিত ও পত্র-পুষ্প-লতা-পতাকায় সুরুচির সহিত সজ্জিত করা হইয়াছে। নাট্যশালার ঠিক মধ্যস্থলে একটি বেদী। সেই বেদীটি একখানি বহুমূল্য কার্পেট দ্বারা আবৃত। তাহার উপর সারি সারি সুকোমল মখমলের তাকিয়া। বেদীর এক পার্শ্বে কয়েকখানি প্লাস্‌মণ্ডিত গদিওয়ালা চেয়ার এবং কৌচ, জেলার রাজপুরুষগণের উপবেশনের জন্য সজ্জিত হইয়াছে।

সন্ধ্যা হইল। পূরবীর তানে নহবৎ বাজিয়া উঠিল। উৎসবের প্রথম পর্ব্ব আরম্ভ হইল।

রাত্রি আটটার সময় কলিকাতা হইতে আনীত বাইজীর নাচ আরম্ভ হইল। বেদীর উপরেই নলিনীনাথ ও

তাঁহার বন্ধুবর্গের জন্য আসন আস্তৃত হইয়াছে। তাহার অনতিদূরে চিকের অন্তরালে পাশাপাশি প্রভা, মহামায়া ও অন্যান্য পুরস্ত্রীগণের বসিবার স্থান হইয়াছে।

মমতাজ প্রকৃত সুন্দরী। তাহার উপর অত্য বিচিত্রভাবে সফেদা পিউড়ি ও চীনে সিন্দুরের সাহায্যে, সে তাহার রূপ একেবারে পরিবর্ত্তিত করিয়া ফেলিয়াছে। মমতাজের পরিধানে বহুমূল্যবান স্বুবর্ণতন্তুবিজড়িত চুম্‌কি-খচিত আসমানি রংয়ের সিল্কের পেশোয়াজ। গায়ে তাহারই অনুরূপ আঙ্গরাখা। সর্ব্বোপরি একখানি পাতলা ওড়না।

তাহার গহনা সমস্তই বহুমূল্য মণি মাণিক্য হীরক মরকত খচিত। নৃত্যকলায় মমতাজের সমকক্ষ তখন আর কেহই ছিল না। তাহার হাব-ভাব অঙ্গসঞ্চালন সমস্তই অনুপম ও গভীর অনুশীলনের পরিচায়ক। মমতাজের অপ্সরোবিনিন্দিত কণ্ঠস্বর মীড় গমক মূর্চ্ছনায় প্রাণময় হইয়া রাগরাগিণীগুলিকে মূর্ত্তিমান ও জাগ্রত করিয়া তুলিতে লাগিল। তাহার চরণলগ্ন নূপুরের সিঞ্জন শ্রোতৃহৃদয়ের মর্ম্মে মর্ম্মে আঘাত করিতে লাগিল। 'সঙ্গতের' তালে তালে নাচিতে নাচিতে

মমতাজ সহসা তাহার মণিখচিত কটিবন্ধে আবদ্ধ মণিময় কোষ হইতে একখানি সুতীক্ষ্ণ ছুরিকা বাহির করিয়া, সেইখানি বার বার ঊর্দ্ধে উৎক্ষিপ্ত করিয়া লুফিয়া লুফিয়া লইয়া, তাহার অদ্ভুত নৃত্যকুশলতা দেখাইতে লাগিল। যখন মমতাজ সেই তীক্ষ্ণফলা ছুরিখানি উৎক্ষিপ্ত করিতেছিল তখন তাহার উজ্জ্বল ফলকে বৈদ্যুতিক আলোক প্রতিফলিত হইয়া বিচিত্র শোভার বিকাশ করিতেছিল। মমতাজের নৃত্যের এই সকল কুশলতা, তাহার এত স্বভাবগত ছিল, যে তাহার ক্রিয়াকলাপে কোনরূপ মনোযোগের লক্ষণ পরিলক্ষিত হইতেছিল না। তাহার তীব্র দৃষ্টি যেন সেই জনতার মধ্যে কাহার অনুসন্ধান করিতেছিল। সর্পীর ন্যায় তাহার অত্যুৎকট জ্বালাময় চক্ষুর্দ্বয় যেন চিকের অন্তরালে আসীনা প্রভার মুখের দিকে বার বার ঈর্ষান্বিত কটাক্ষ বিক্ষেপ করিতেছিল। দর্শকগণ মোহিত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে তাহার নৃত্যকলার প্রশংসা করিতে লাগিলেন। মমতাজও তাঁহাদের প্রত্যেকের কাছে গিয়া 'আও বাৎলাইতে' আরম্ভ করিল। এইরূপ ভান করিয়া, মমতাজ গৃহের কর্ত্রী প্রভার সমীপবর্ত্তিনী

হইবার জন্য বার বার চেষ্টা করিতে লাগিল। ক্রমে ক্রমে তাহার সমীপবর্ত্তীও হইল। নাচিতে নাচিতে মমতাজ প্রভার কাছে গিয়া একবার তাহার ছুরিকাখানি উর্দ্ধে উৎক্ষিপ্ত করিল। পরে প্রভাকে একটু অন্যমনস্ক দেখিয়া, মমতাজ সেই সুযোগে তাহার ছুরিখানি দৃঢ়মুষ্টিতে ধরিয়া, প্রভার বক্ষঃস্থলে আমূল বসাইয়া দিয়া আবার সে খানিকে টানিয়া বাহির করিয়া লইল। প্রভা চীৎকার করিয়া ভূমে পড়িয়া গেল। মহামায়া তাড়াতাড়ি প্রভাকে দেখিতে গেল। সেই অবসরে মমতাজ ছুরিখানি মহামায়ার বক্ষে আমূল বসাইয়া দিল। জনতা এই ব্যাপারে একেবারে স্তম্ভিত হইয়া রহিল। জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট্ ও পুলিস্ সাহেব, তাঁহাদের সাক্ষাতে, এইরূপ দুই দুইটা খুন হইল দেখিয়া, যেন কিছু থতমত খাইয়া গেলেন। মমতাজ নিমেষে ছুরিখানি মহামায়ার বুক হইতে উঠাইয়া লইয়া নিজের বুকে আমূল বসাইয়া দিল। অর্জ্জুনের বাণবিদ্ধ বসুন্ধরার বক্ষ হইতে উৎসারিত ভোগবতীর ন্যায় মমতাজের বক্ষঃস্থল ভেদিয়া রক্তধারা উৎক্ষিপ্ত হইয়া তাহার পরিধেয় সিক্ত করিয়া ফেলিল। জনতা

হাহাকার করিয়া উঠিল। নলিনীনাথ উন্মাদের ন্যায় আততায়িনীর সমীপবর্ত্তী হইয়া দেখিলেন যে বাইজী আর কেহ নহে—মমতাজ!

নলিনীনাথ বিস্মিত হইয়া কহিলেন "এ্যা—কে তুমি? মমতাজ!"

মমতাজ ক্ষীণকণ্ঠে কহিল "হ্যাঁ—আমি মমতাজ।"

নলিনীনাথ জিজ্ঞাসিলেন "কেন মমতাজ! তুমি এমন কাজ করিলে?"

মমতাজ আপন-ললাটের দিকে দেখাইয়া কহিল "বিধিলিপি।"

এই কথাটির সঙ্গে সঙ্গে মমতাজের ক্ষীণ প্রাণ-বায়ুটুকু আকাশে মিশাইয়া গেল।

প্রভা ও মহামায়ারও আঘাত সাংঘাতিক। ছুরিকা তাহাদের উভয়ের হৃদয় বিদ্ধ করিয়াছিল। তাহারা দুই জনেই রক্তমোক্ষণে ক্রমে ক্ষীণ হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইল।

জনতা 'হায়! হায়!' করিতে করিতে বিদায় হইল। রাজপুরুষগণ রাত্রি অধিক হইয়াছে দেখিয়া আপন আপন

আবাসে প্রস্থান করিলেন। কেবল পুলিস-সাহেব খুনের রিপোর্ট দিবার জন্য 'অকু'-স্থলে হাজির রহিলেন।

উৎসবমণ্ডপ বিরাট শ্মশানে পরিণত হইল।

বিংশ পরিচ্ছেদ।

নিশা প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে। উষার অস্পষ্টালোকে দেখা যাইতেছে, পদ্মাতীরে বালুকার চড়ার উপর, সারি সারি তিনটি নির্ব্বাণ-প্রায় চিতা! এখনও সেগুলি হইতে অল্প অল্প ধূমোদ্গীরিত হইতেছে। ধূমরেখা ক্রমে ক্ষীণা হইয়া আসিল। চিতা নিভিল। তিনটি নারীহৃদয়ের অব্যক্ত বেদনার জ্বালা সর্ব্বংসহা পদ্মাবতী নিজের বুকে টানিয়া লইয়া বিশ্ব-প্রীতি-উচ্ছ্বসিত গীতি গাহিতে গাহিতে অনন্ত সাগর পানে চলিলেন। প্রাণময়ী গাহিতেছিলেন "আয়—কে কোথায় শোকসন্তপ্ত ত্রিতাপদগ্ধ আছিস্। আমার বুকে স্থান পাইবি।" অন্ত্যেষ্টি সমাধা করিয়া সকলে চলিয়া গিয়াছে। কেবল নলিনীনাথ সেই বালির চড়ার উপর বসিয়া একবার আকাশপানে চাহিতেছেন। একবার সেই নির্ব্বাণ চিতার দিকে দেখিতেছেন। নলিনীনাথ ভাবিতেছিলেন যে তাঁহার জীবন-নাটক যেমন লোমহর্ষণ ঘটনারাজিতে পূর্ণ, এমন বুঝি আর

কাহারও হয় না। এইখানেই কি ইহার শেষ? এইখানেই কি ইহার যবনিকা পড়িবে? নলিনীনাথের কণ্ঠে তাঁহার মাতৃদত্ত সেই রত্নহার। নলিনীনাথ মনে করিলেন—এই রত্নহারই আমার কাল। তিনি ধীরে ধীরে তাঁহার গলদেশ হইতে রত্নমালাটি খুলিলেন। বার বার তাহা দেখিতে লাগিলেন। বাল-সূর্য্যের কিরণ নবরত্ন-খচিত পদকে পড়িয়া চতুর্দ্দিকে ঠিকরিয়া পড়িতে লাগিল। পদকটি প্রাণময় চৈতন্যময় ভাবিয়া নলিনীনাথ শিহরিয়া উঠিলেন। তাড়াতাড়ি সেটিকে পদ্মাবতীর বক্ষে টান মারিয়া ফেলিয়া দিবার উদ্যোগ করিলেন।

সহসা, কে আসিয়া, পশ্চাৎ হইতে মোহজনক স্পর্শে নলিনীনাথের স্কন্ধে অতি সন্তর্পণে অঙ্গুলি-তাড়ন করিল।

নলিনীনাথ ফিরিয়া চাহিয়া দেখিলেন—একজন মহা-পুরুষ। মরণের প্রাক্কালে নলিনীনাথের মাতা যে মহাপুরুষের কথা বলিয়াছিলেন, তাঁহার সহিত ইহার আকৃতির সৌসাদৃশ্য আছে।

তবে ইনিই কি তিনি?

নলিনীনাথ মহাপুরুষকে সাষ্টাঙ্গে প্রণমিয়া কহিলেন "দেবতা! আমি চিনিয়াছি—আপনি কে? যদি আসিলেন, তবে এত দেরী করিয়া কেন?"

মহাপুরুষ কহিলেন "না, নলিনীনাথ! আমি ঠিক সময়েই আসিয়াছি। তুমি মনে করিও না, যে তোমার জীবন নাট্যের যবনিকা এইখানেই। কেবল একটিমাত্র অঙ্ক শেষ হইয়াছে। এখনও অনেক অবশিষ্ট আছে।"

নলিনী। না প্রভু! আমি এইখানেই এই বিসদৃশ নাট্যাভিনয় শেষ করবো। দুর্লঙ্ঘনীয়া নিয়তিও আর আমার সঙ্কল্পের পথে অন্তরায় হতে পারবে না। আর বেঁচে থেকে ফল কি?"

ধীরগম্ভীর স্বরে মহাপুরুষ কহিলেন "সৌম্য! কার্য্যমাত্র তোমার। ফলাফল শ্রীকৃষ্ণের। স্বয়ং ভগবানের শ্রীমুখ-নিঃসৃত অমৃতোপম উপদেশ বিস্মৃত হয়ো না। তিনি বলিয়াছেন,"—

"কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন।
মা কর্ম্মফলহেতুর্ভূর্মা তে সঙ্গোঽস্ত্বকর্ম্মণি॥

বিংশ পরিচ্ছেদ

যোগস্থঃ কুরু কর্ম্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা ধনঞ্জয়।
সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোঃ সমো ভূত্বা সমত্বং যোগ উচ্যতে ॥
দূরেণ হ্যবরং কর্ম্ম বুদ্ধিযোগাদ্ ধনঞ্জয়।
বুদ্ধৌ শরণমন্বিচ্ছ কৃপণাঃ ফলহেতবঃ ॥
বুদ্ধিযুক্তো জহাতীহ উভে সুকৃত দুষ্কৃতে।
তস্মাদ্ যোগায় যুজ্যস্ব যোগঃ কর্ম্মসু কৌশলম্ ॥
কর্ম্মজং বুদ্ধিযুক্তা হি ফলং ত্যক্ত্বা মনীষিণঃ।
জন্মবন্ধ বিনির্ম্মুক্তাঃ পদং গচ্ছন্ত্যনাময়ম্ ॥" *প্র

"বৎস! তোমার এখানকার কাজ শেষ হয়েছে। কিন্তু এর চেয়ে শ্রেষ্ঠতর প্রশস্ততর কার্য্য-ক্ষেত্র তোমার সম্মুখে। শোক পরিহার কর। কার জন্য শোক? কিসের জন্য শোক? কে মৃত? কে জীবিত? সবই তাঁহার মায়া। সমস্তই তাঁহার প্রপঞ্চ।"

---

* প্র—কর্ম্মেই তোমার অধিকার। ফলে নহে। ফলের আশায় কর্ম্ম করিও না। আর, পাছে কর্ম্মফল তোমার সংসার বন্ধের কারণ হয়, এই ভয়ে কর্ম্ম হইতে বিরতও হইও না।

হে ধনঞ্জয়! নিজের কর্ত্তৃত্বাভিমান ত্যাগ কর। কর্ম্ম সফলই হউক, নিষ্ফলই হউক, তজ্জন্য হৃষ্টও হইও না, বিষণ্ণও হইও না। এই সমত্ব জ্ঞানের নামই—যোগ। তুমি যোগস্থ হইয়া কর্ম্ম করিয়া যাও।

হে ধনঞ্জয়! জ্ঞানযোগ অপেক্ষা কাম্য কর্ম্ম নিকৃষ্টতর। অতএব

"ন জায়তে ম্রিয়তে বা কদাচিৎ
নায়ং ভূত্বা ভবিতা ন ভূয়ঃ।
অজো নিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ং পুরাণোঃ
ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে।" *দ্বি

"নলিনীনাথ! আমার সঙ্গে এস!"

এই বলিয়া মহাপুরুষ পদ্মার সিকতাময় তট বহিয়া বরাবর চলিতে লাগিলেন। নলিনীনাথ মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন।

তুমি জ্ঞানসাধনে কর্ম্মযোগ আশ্রয় কর। এবং সেই জ্ঞানসাধনের জন্য ঈশ্বরের শরণ লও। সকাম মানবেরা হেয়। তুমি নিষ্কাম হও।

সমত্ববুদ্ধিযুক্ত জ্ঞানযোগী ইহজন্মেই সুকৃত ও দুষ্কৃত ত্যাগ করেন। তুমিও নিষ্কামভাবে কর্ম্ম করিয়া যাও। নিষ্কাম কর্ম্মে কুশলতা অর্জ্জনই প্রকৃত যোগ।

সমস্ত বিষয়ে সমত্বাবুদ্ধিসম্পন্ন জ্ঞানীগণ কর্ম্মফলাশা ত্যাগ করিয়া থাকেন এবং অন্তে জন্মরূপ বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া সর্ব্বোপদ্রবশূন্য মোক্ষপথ প্রাপ্ত হন।

* দ্বি—(আত্মা) কখনও জন্মেন না। মৃতও হন না। ইঁহার উদ্ভব নাই। স্থিতিও নাই। কারণ ইনি জন্মরহিত, নিত্য, অপক্ষয়শূন্য ও পরিণামশূন্য। শরীরের বিনাশ হইলেও, ইঁহার কিছুতেই লয় নাই।

উপসংহার।

যে সময়ে পূর্ব্বপরিচ্ছেদে বর্ণিত ঘটনা সংঘটিত হইয়াছিল, তাহার পরে পূর্ণ দশ বৎসর অতীত হইয়াছে। কর্ম্মময় জগৎ, জগৎপতির বিরাট হস্তে, নিয়তির ক্ষীণ তন্তুতে বদ্ধ থাকিয়া, যুগ যুগ ধরিয়া যে মার্গে যে বিধিতে চলিয়া আসিয়াছে, আজিও ঠিক সেইরূপ চলিতেছে। এই সুদীর্ঘ দশ বৎসরে, সাগর বক্ষে বুদ্‌বুদ-কণিকার মত বিশ্বের বুকে কত প্রাণী জন্মিয়াছে! আবার বিলীন হইয়া গিয়াছে! কে তাহার সংবাদ লয়? কে তাহা ভাবে?

নলিনীনাথ নিরুদ্দিষ্ট হওয়ার পর, ভগবান দেওয়ান তাহার সন্ধান করিবার জন্য কত চেষ্টা করিলেন। পত্রিকায় পত্রিকায় বহুদিন ধরিয়া এই নিরুদ্দেশের সংবাদ ঘোষণা করিলেন। বহু পুরস্কারের প্রলোভন দেখাইলেন। কোন ফলই ফলিল না। পরে অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া, উপায়ান্তর না দেখিয়া, নলিনীনাথের সম্পত্তি কোর্ট অফ্ ওয়ার্ডসের হস্তে দিয়া বৃদ্ধ বৃন্দাবনবাসী হইলেন। নলিনীনাথের নিদারুণ দুঃখময় জীবনলীলা কালস্রোতে বিস্মৃতির অতলগর্ভে ডুবিয়া গেল।

এইমাত্র নিশা অবসান হইয়াছে। নবোদিত অরুণোদয়ে পশ্চিমাশা হিঙ্গুলরাগে রঞ্জিত হইয়াছে। হিমকর কমলমধুর ন্যায় ঈষল্লোহিত পক্ষপুটশালী পরিণত-বয়াঃ কলহংসের মত, সুরতরঙ্গিণী মন্দাকিনীর রজতময় সৈকততট হইতে পশ্চিম সাগরের বিশাল পুলিনে অবতরণ করিতেছেন। দিক্‌চক্রবালে কে একজন নিপুণ শিল্পী যেন একখানি বিশাল পাণ্ডুবর্ণ রাঙ্কবাস্তরণ রচনা করিয়া রাখিয়াছেন। যেন কোন ঐন্দ্রজালিকের করস্পর্শে সেই ধূসরিমা ক্রমে সমস্ত আকাশে ছড়াইয়া পড়িতে লাগিল। গজরুধির-লিপ্ত কেশরী-কেশরের ন্যায়, নবোদ্গত কিশলয়ের ন্যায়, ঈষত্তপ্ত লাক্ষাতন্তুর ন্যায় পাটলবর্ণ সুদীর্ঘ সূর্য্যরশ্মিগুলি, যেন পদ্মরাগমণি-শলাকায় বিরচিত সম্মার্জ্জনী দ্বারা গগনকুট্টিম হইতে নিশারাণীর হস্তোৎক্ষিপ্ত তারকাকুসুমগুলিকে সমুৎসারিত করিয়া দিতেছে। পুণ্যমূর্ত্তি সপ্তর্ষিমণ্ডল উত্তরাশার অম্বর-তলরূপ পর্ণশয্যা পরিত্যাগ করিয়া প্রাতঃস্নানের জন্য মানস সরসীর তীরে অবতরণ করিতেছেন। অরুণের হেমরশ্মি-জাল তুষার-কিরীটী হিমালয়ের শুভ্রশীর্ষে প্রতিফলিত ও বিচ্ছুরিত হইয়া নির্ম্মল স্ফাটিক দর্পণে কনক-রেখার

ন্যায় প্রতীয়মান হইতেছে। বিকশিত শুক্তি-সম্পুট-স্খলিত
মুক্তাফলের ন্যায় ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত মেঘগুলি পশ্চিম সমুদ্রতট
ধবলিত করিয়াছে। তপোবনবাসী তাপসদিগের সদ্যোসংস্কৃ
উটজাঙ্গনে প্রজ্জ্বালিত হোমাগ্নি হইতে উত্থিত ধূসর
ধূমরেখা তরুশিখরে পারাবতমালার ন্যায় কুণ্ডলিত হইয়া
ঘুরিতেছে।

শঙ্করাবতার ভগবান শঙ্করাচার্য্যের প্রতিষ্ঠিত যোশীমঠ
হিমালয়ের হিমময় বক্ষে পবিত্র কেদার-ক্ষেত্রে অবস্থিত
এই যোশীমঠের সন্নিকটে একটি পরম শান্তি-নিকেতন
তপোবন। তপোবনের প্রাঙ্গণের মধ্যস্থলে একটি বিল্ববৃক্ষ
তাহার তলে অজিনাসনে উপবেশন করিয়া একজন
দীর্ঘাকার প্রবীণ মহাপুরুষ। তাঁহার সম্মুখে বসিয়া
একজন নবীন তাপস। তাঁহাদের উভয়ের মুখে বিমল
প্রেমানন্দ। তাঁহাদের চোখে উছলিত জ্ঞান ও প্রতিভার
তীব্র জ্যোতি।

ধীর গভীর স্বরে মহাপুরুষ কহিলেন "নলিনীনাথ
তোমার সহিত আমার সাক্ষাৎ, পূর্ণ দশ বৎসর পূর্ব্বে
এই ব্রাহ্ম মুহুর্ত্তে। এই সিতপক্ষীয় গুরুবাসরে। মনে

পড়ে কি সে কথা? তুমি মোহ-পরবশ হয়ে, অনিত্যের জন্য, শাশ্বত ধন হারাতে যাচ্ছিলে। এখন তোমার কি বিশ্বাস? সুখ—ভোগে না ত্যাগে?

"ত্যাগে"

সমাপ্ত।

বিজ্ঞাপন।

'রিজিয়া' প্রণেতা

মনোমোহনের **টীকা-সংস্করণ** গ্রন্থাবলী

আজকাল বাঙ্গালায় উপন্যাস পাঠের উপর অনুরাগ বাড়িয়াছে। উপন্যাস সুখপাঠ্য ও শিক্ষাপ্রদ করা ঔপন্যাসিকের পক্ষে অতি কঠিন কার্য্য। উপন্যাসে ভাষা ভাব ঘটনা ও চরিত্র-বৈচিত্র্য থাকা নিতান্ত প্রয়োজন। মনোমোহন বাবুর লিপিকুশলতার পরিচয় অনাবশ্যক। নাটকে 'রিজিয়া' তাঁহার কৃতিত্বের পরিচয়। অনুবাদে 'লা মিজারেবল্' 'কেনিল্ওয়ার্থ' 'মারচ্যাণ্ট অফ ভিনিস্' 'হ্যাম্লেট্' ইত্যাদি তাহার প্রমাণ। উপন্যাসে 'লীলার স্বপ্ন' তাঁহার অপূর্ব্ব সৃষ্টি। এই গ্রন্থমালার প্রত্যেকখানি গ্রন্থই সেই নিপুণ লেখনী-প্রসূত, স্বতন্ত্র, বিশেষত্বপূর্ণ ও চিত্তাকর্ষক। মাসে মাসে দুইখানি করিয়া প্রকাশিত হইতেছে।

মূল্য ঃ—তালিকাভুক্ত গ্রাহকদিগের জন্য ১৲ এক টাকা। অপর গ্রাহকদিগের জন্য ১।০ পাঁচসিকা। ডাক মাশুল প্রত্যেক গ্রন্থের জন্য, দুই আনা, স্বতন্ত্র।

দ্রষ্টব্য ঃ—গ্রাহক-শ্রেণীভুক্ত হইতে হইলে অগ্রিম কিছুই দিতে হইবে না। কেবল নাম-ধামসহ আমার নিকট পত্র লিখিলেই গ্রাহক শ্রেণী ভুক্ত করিয়া লওয়া হয়। ও এই গ্রন্থমালার যখন যে খানি প্রকাশিত হয়, সেই খানি ভি পিতে পাঠান হয়।

আর একটি সুবিধা—

এই গ্রন্থমালার বহুল প্রচার ও স্থায়িত্ব সংস্থাপন সংকল্পে আমরা এই সংস্করণের গ্রন্থাবলীর রীতিমত গ্রাহকদিগকে আমাদিগের মাসিকে-পরিবর্ত্তিত 'প্রবাহিণী' নাম্নী সুলিখিত ও সুপরিচিত পত্রিকা স্বল্পমূল্যে উপহার দিব, স্থির করিয়াছি।

'প্রবাহিণী'ও মনোমোহন বাবুর সম্পাদকত্বে পরিচালিত হইবে। বঙ্গের খ্যাতনামা লেখক-লেখিকাদিগের লেখায় মণ্ডিত কলেবরে নূতন সাজে 'প্রবাহিণী' আগামী আশ্বিনের ১লা তারিখে বাহির হইবে।

প্রবাহিণীর মূল্য :—মনোমোহন বাবুর টাকা-সংস্করণ গ্রন্থমালার তালিকা-ভুক্ত গ্রাহকদিগের জন্য বার্ষিক ২৲ দুই টাকা মাত্র। অপর গ্রাহকদিগের জন্য ৪৲ চারি টাকা। ডাক মাশুল স্বতন্ত্র লাগিবে না।

প্রবাহিণীর গ্রাহকদিগকেও অগ্রিম কিছুই দিতে হইবে না। কেবল নাম ও ঠিকানা পাঠাইলেই গ্রাহক-শ্রেণীভুক্ত করিয়া লওয়া হইবে। ও মাসে মাসে 'প্রবাহিণী' কেবলমাত্র সেই মাসের সংখ্যার মূল্য ধরিয়া ভি, পি, করিয়া গ্রাহকদিগের নিকট প্রেরিত হইবে।

বলা বাহুল্য যে, কেবলমাত্র গ্রাহকগণের সহানুভূতি ও সহায়তার উপরই আমাদের এই উদ্যমের সাফল্য সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করিতেছে।

অদ্যই গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত হইবার জন্য পত্র লিখুন :—

প্রকাশক—বিনীত, শ্রীসতীশচন্দ্র মিত্র।

লক্ষ্মীবিলাস পাবলিশিং হাউস.

১২নং নারিকেল বাগান লেন, কলিকাতা।